আদর্শ মানুষ

মাওলানা মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন

আদর্শ মানুষ

মুহাম্মাদ হেলালউদ্দীন

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১০
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
রুকু শাহ্ কম্পিউটার

মূল্য : ষাট টাকা

AHDARSH MANUSH by Md. Helaluddin. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication : February 2004.

Website : www.oitijjhya.com

Price : 60.00 US $ 3.00

ISBN 984-776-268-6

www.pathagar.com

আমার শিক্ষাজীবনের
সমস্ত প্রেরণার উৎস
আব্বা-আম্মার
উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা ৯

সমাজ বিভিন্ন স্তরে আদর্শ মানুষের রূপরেখা ১৪-৫৫

পারিবারিক জীবন-আদর্শ স্বামী-স্ত্রী ১৪

আদর্শ মাতা-পিতা ১৬

আদর্শ সন্তান ১৭

শিক্ষাজীবন-আদর্শ শিক্ষক ২১

আদর্শ ছাত্র ২৩

আদর্শ সাহিত্যিক ২৪

আদর্শ বৈজ্ঞানিক ২৫

আদর্শ ডাক্তার ২৬

আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার ২৭

অর্থনৈতিক জীবন

আদর্শ কৃষক ২৯

আদর্শ শ্রমিক ৩০

আদর্শ ব্যবসায়ী ৩১

সামাজিক জীবন

আদর্শ নাগরিক ৩৫

আদর্শ আইনজীবী ৩৬

আদর্শ সমাজ-সংস্কারক ৩৯

আদর্শ ধর্মীয় নেতা ৪৪

আদর্শ বিচারক ৪৫

রাষ্ট্রীয় জীবন

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ৪৭

আদর্শ সৈনিক ও সেনাপতি ৫২

আদর্শ সরকারি কর্মচারি ৫২

আদর্শ রাষ্ট্রদূত ৫৪

আদর্শ মানুষ গঠনের উপায় ৫৬-৭০

এই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ ৫৬

বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিরূপণ ৫৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ্ প্রেরিত বার্তাবহ কর্তৃক দেয়া আল্লাহ্-
মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসরণ ৬০
আদর্শ মানুষ সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা ৬৬

আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্ত **৭১-৯৪**
হযরত আবু বকর (রাঃ) ৭১
হযরত ওমর (রাঃ) ৭৪
হযরত ওসমান (রাঃ) ৮০
হযরত আলী (রাঃ) ৮১
হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয ৮৩
ইমাম আবু হানিফ (রাঃ) ৮৮
হযরত ফাতিমা (রাঃ) ৮৯
গাজী সালাহউদ্দীন ৯০
আওরঙ্গযিব আলমগীর ৯১

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

বিশ্ব-সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর বুকে মানুষ নামের প্রাণী বাস করছে। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বাস। ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বাস করছে এখানে। মানুষ সামাজিক জীবও বটে। আর সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবনধারারও অগ্রগতি হয়েছে। সাথে সাথে সমস্যাও বেড়েছে অনেক। আজ আর কোন মানুষই একা একা বাস করতে পারে না। একা সে তার সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। অতএব এক মানুষকে অপর মানুষের ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করতে হয়। এই পর্যায়ে সমাজকে সুখী, সমৃদ্ধশালী করার জন্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক ; কিন্তু এই সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব মানুষের মাঝে সৃষ্টি করার পথ কি? সহানুভূতির স্থলে হৃদয়হীনতা, সহযোগিতার জায়গায় স্বার্থপরতা দেখা দিলে সমাজ-জীবন সুখী হতে পারে না, একথা স্বতঃসিদ্ধ ; কিন্তু কি উপায়ে এসব গুণ এবং এমনি ধরনের অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী মানুষের স্বভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, সেটাই বিবেচ্য।

মানুষের স্বভাবে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি বা প্রবৃত্তি বিরাজমান। এর একটা হচ্ছে সুপ্রবৃত্তি আর অপরটা হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি। স্বভাব-চরিত্রে যে প্রবৃত্তি প্রবল সেটাই মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যে মানুষের মধ্যে সুপ্রবৃত্তি প্রবল তাকে আমরা আদর্শ মানুষ, ভালো মানুষ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকি। ইদানিং আমাদের দেশে এই আদর্শ মানুষকে 'সোনার মানুষ' আখ্যা দেয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে যে মানুষের স্বভাবে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব প্রবল তাকে অসৎ ও আদর্শহীন বলে আখ্যা দিই আমরা।

বর্তমান যুগে আদর্শ মানুষের চাহিদা অত্যন্ত প্রকট। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সকল দেশেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই আদর্শ মানুষের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূলত সমাজের যে স্তরে চরিত্রবান লোকের অভাব সে স্তরেই বিপর্যয় দেখা দেয়। জাতীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের সমাজ জীবন পর্যন্ত সর্বস্তরে যোগ্য ও চরিত্রবান লোকের প্রয়োজন। আমাদের পারিবারিক জীবন তখনই সুখী হতে পারে যখন পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি সঠিকভাবে তার কর্তব্য পালন করে। রাজনৈতিক জীবন তখনই কল্যাণকর হতে পারে যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান যুগে অর্থনীতির

www.pathagar.com

গুরুত্ব অত্যধিক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে সারা বিশ্বে। অর্থনীতির এই ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে অর্থনীতির কর্ণধারগণ সকলেই হিমসিম খাচ্ছেন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ; কিন্তু এই সমস্যা যেন আরো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এই অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কাজও একমাত্র যোগ্য ও সৎ অর্থনীতিবিদ করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষা অঙ্গনে আজ যে নৈরাজ্য দেখা দিচ্ছে যার প্রতিক্রিয়া যুব সমাজের শিক্ষা জীবনকে পঙ্গু করতে বসেছে, সেখানেও আদর্শ মানুষ তথা আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ শিক্ষার্থীর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনেও এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজমান। একই দেশের বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে সদ্ভাবের ও সহযোগিতার অভাব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস লেগেই আছে। আজ বৃহৎ শক্তিবর্গ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও কম শক্তিশালী জাতিগুলোকে কোণঠাসা করে রাখতে ব্যস্ত। বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে দুর্বল শক্তিগুলোর বেঁচে থাকার কোন অধিকারই যেন নেই। এদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে সর্বত্র। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে দুর্বল জাতিগুলো সদা আতঙ্কগ্রস্ত। বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে ফেলে রেখেছে। বিশ্ব পরিস্থিতির এই অনিশ্চিত অবস্থার মূলীভূত কারণ আদর্শ মানুষ তথা আদর্শ নেতৃত্বের অভাব। বলা বাহুল্য, বর্তমান পৃথিবীর সার্বিক কাজকর্ম আদর্শ নেতৃত্বের ওপর ন্যস্ত করার উপরই গোটা বিশ্বের কল্যাণ নির্ভর করছে। বিশ্বব্যাপী আজ যে মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছে; অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতনের মহাপ্লাবন বয়ে চলেছে; মানব-চরিত্রে যে সর্বাত্মক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতি স্তরে যে বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে, পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং মানুষের আবিষ্কৃত সকল শক্তি ও যন্ত্র যেভাবে মানব-কল্যাণের পরিবর্তে বিশ্ব-মানবতার ধ্বংসের কাজে অবলীলাক্রমে নিয়োজিত হচ্ছে, এর একমাত্র কারণ আদর্শ মানুষ তথা আদর্শ নেতৃত্বের অভাব। সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে আদর্শ চরিত্রের লোকের অভাব নেই; কিন্তু তারা সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ নয় বলে অধিকাংশ স্থলে নৈতিক চরিত্র বিবর্জিত লোকের হাতে সমাজ পরিচালনার চাবিকাঠি রয়েছে। তাছাড়া, কোন মানুষ যতই আদর্শ চরিত্রের হোক-না কেন, তার একক প্রচেষ্টায় সমাজের কল্যাণ সাধন অসম্ভব। তার সাথে প্রয়োজন এক আদর্শ চরিত্রবান কর্মী-বাহিনীর। এমনকি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার মালিক রাষ্ট্রনেতাও একা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারেন না, যতক্ষণ না তার সাথে সমআদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদল তার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদর্শ মানুষ হবার উপায় কি এবং মানুষের মধ্যে যেসব সুকুমার বৃত্তি বর্তমান সেগুলো সজাগ রাখার ও পরিচর্যা করার উপায় কি? আগেই বলা হয়েছে মানুষের স্বভাবে সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই বিরাজ করছে। অতএব

www.pathagar.com

সুপ্রবৃত্তিটাকে সদা জাগ্রত রাখার সাথে সাথে মানুষকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তার কুপ্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে। আর এ প্রক্রিয়ার দ্বারাই একটি মানুষ চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ রূপে গণ্য হতে পারবে। আসলে মানব-স্বভাবে এই দু'প্রকার প্রবৃত্তির সমাবেশ সহজাত ও প্রকৃতিগত। এ দ্বারা স্রষ্টা দেখতে চান মানুষ তার জীবন সংগ্রামে স্বেচ্ছায় এবং বাইরের চাপ ছাড়াই জীবন যাপন করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না। দৃঢ়চিত্ত মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিকে অবশ্যই দমিয়ে রাখতে সক্ষম, যদি সে তা করতে চায়। আবার সে তার সুপ্রবৃত্তিকে সমুন্নত রেখে নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতেও সক্ষম, যদি সে এজন্যে সচেষ্ট হয়। মানুষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা কারুর নেই। জোর-জবরদস্তি করে শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব; কিন্তু মনের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়া যায় না। কাজেই আদর্শ মানুষ হওয়া না হওয়া তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। মানুষ কিন্তু জন্মগতভাবে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। সাধারণত পরিবেশের প্রভাবে সে তার এই জন্মগত স্বভাব পরিবর্তনের উৎসাহ পায়। জ্ঞানবুদ্ধি সমৃদ্ধ মানুষ ইচ্ছা করলে বাইরের কলুষ ও অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সে নিজেই যখন বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে ভালো-মন্দের তারতম্য করতে সক্ষম, তখন সে অবশ্যই ভালোটাকে গ্রহণ এবং মন্দটাকে বর্জন করতে সক্ষম।

এবার আমরা আলোচনা করে দেখবো কি ধরনের গুণ থাকলে মানুষ আদর্শ মানুষ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আগেই বলে নেয়া প্রয়োজন, সদ্‌গুণ ও অসদ্‌গুণ চিরদিন নিজ নিজ গতিপথে প্রবাহিত। আজ যা সদ্‌গুণ বলে সমাদৃত এবং যা অসদ্‌গুণ বলে ঘৃণিত; কাল তার পরিবর্তন অসম্ভব ও অবান্তর। যারা একে পরিবর্তনশীল বলে মনে করে তারা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনার ব্যাধিতে ভুগছে। সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মসম্মান, সৌজন্য ও সভ্যতা-ভব্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, সংযমশীলতা ও সহনশীলতা, প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন ইত্যাদি চিরদিন সদ্‌গুণ হিসেবেই পরিগণিত। পক্ষান্তরে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, হৃদয়হীনতা, পরশ্রীকাতরতা অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতা, অসৌজন্য ও অভদ্রতা, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আবহমানকাল থেকে অসদ্‌গুণের তালিকাভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে সদ্‌গুণ ও অসদ্‌গুণ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ধারণা আধুনিক 'উর্বর' মস্তিষ্কের আবিষ্কার। ইংরেজিতে একটা কথা আছে The end justifies the means—এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে—উদ্দেশ্য মহৎ হলে সে উদ্দেশ্য সাধনে যেকোন উপায় অবলম্বন করা হোক না কেন সেটা

www.pathagar.com

ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হবে। এটা যদি সঠিক ধারণা বলে গ্রহণ করা হয় তবে নৈতিকতা ও সদ্‌গুণ চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকবে কি? মানুষের মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগরুক রাখার কোন পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করা যাবে কি? একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বিচার করে দেখা যাক। দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ধনী লোকদের ঘরে একজন ডাকাত ডাকাতি করে। উদ্দেশ্য যেহেতু মহৎ—দরিদ্রের সেবা, অতএব তার ডাকাতির কাজ ন্যায়সঙ্গত, এই উপপাদ্য যদি ঠিক না হয় তবে উপরোল্লেখিত ধারণা সঠিক বলে মেনে নেয়া যাবে কি করে ? আসলে এটা একটা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

একটু চিন্তা করলেই আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, একটি অন্যায়কে দূর করার জন্যে যদি অন্যায়ের আশ্রয় নেয়া হয় তবে স্বভাবতই একটি অন্যায়ের সাথে আরো দশটি অন্যায় করতে হবে। তাছাড়া যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কোন বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করতে চাইলে তো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করে একটানা কাজ করে যেতে হয় বছরের পর বছর ধরে। এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মতৎপরতায় যদি অন্যায় পথ অবলম্বন করা হয় তবে অবশ্য সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠবে। পরবর্তীকালে সে মানসিকতা হঠাৎ করে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা সৎ ও মহৎ না হবার কারণে কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতা ও কর্মিগণের স্বভাব-চরিত্রে যে স্বাভাবিক ছাপ লেগেছে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ব্যবহার ও কর্মে সেটা প্রতিভাত হবেই। অতএব কোন মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে মহৎ তথা ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। তাহলে উপরোক্ত ইংরেজি বাক্যটা এভাবে পরিবর্তন করা উচিত বলে আমরা মনে করি : The means justifies the end. অর্থাৎ উপায়-উপকরণ যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করা হয় তবে বুঝতে হবে যে উদ্দেশ্যও মহৎ।

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানুষ হবার জন্যে আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন একথা স্বতঃসিদ্ধ। আবার আদর্শ চরিত্রের জন্যে যেসব সদ্‌গুণাবলী আয়ত্ত করা প্রয়োজন, সেগুলো আমাদের সকলেরই জানা ; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো আয়ত্ত করার উপায় কি? বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারলেই স্বাভাবিক গতিতে মানব চরিত্রে সদ্‌গুণাবলী বিকাশ লাভ করতে পারে। এই বিশেষ মানসিকতা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে গড়ে ওঠে। এই বিশেষ আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার জন্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দৈনন্দিন কর্মতৎপরতায় সাধারণত যেসব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি আভাস দেয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য সমাজের সর্বস্তরের

www.pathagar.com

লোকের মধ্যে আদর্শ চরিত্রের একটা স্বাভাবিক চেতনাবোধ থাকলে স্বভাবতই সমাজজীবনে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি আদর্শ চরিত্রের অনুসারী হয় তবেই সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তখন মুষ্টিমেয় লোক চরিত্রহীন ও দুষ্কৃতিকারী হতে চাইলেও তা হবার সুযোগ পাবে না।

www.pathagar.com

সমাজের বিভিন্ন স্তরে আদর্শ মানুষের রূপরেখা

পারিবারিক জীবন

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নারী ও পুরুষ নিয়ে ছোট সংসারের শুরু। গুহাবাসের যুগেও নারী-পুরুষের দ্বৈত প্রচেষ্টায়ই ছোট্ট পরিবার গড়ে ওঠে। পুরুষ শারীরিক দিক থেকে সবল সাহসী বলে পুরুষই এই ছোট্ট সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয় এবং নারী পুরুষের এই কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সমাজ বিবর্তনের ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে নারী-পুরুষের এই সহযোগিতার পরিধি বর্তমানে আরও বেড়েছে বৈ কমেনি। নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাকৃতিক সহজাত ও স্বাভাবিক। এদের একের প্রতি অপরের আকর্ষণ, অনুরাগ ও আসক্তির সৃষ্টি রহস্যের একটা আশ্চর্য অবদান। এটা একটা নিছক যৌন সম্পর্ক নয়, যেমন পরিলক্ষিত হয় ইতরপ্রাণীকূলের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা পবিত্র সম্পর্ক। এ কারণেই সভ্য সমাজের নারী পুরুষের এই পবিত্র সম্পর্ককে উভয়ের সম্মতিক্রমে আইনসম্মত করে নেয়া হয় আর এই সম্পর্ককে বলা হয় বিবাহ বন্ধন। মানুষ সব দিক চিন্তা করেই এই সম্পর্ক স্থাপন করে। উভয়ের সম্মতিক্রমে একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তির মাধ্যমে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষই অতি সন্তর্পণে নিষ্ঠার সাথে এই চুক্তিটি মেনে চলে। তারা তখন প্রেম ও প্রীতি, স্নেহ ও মমতার পবিত্র স্পর্শে একাত্ম বোধ করে। শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে সারা দেহ যেরূপ রোগযন্ত্রণা অনুভব করে, এদের যেকোন একজন ব্যথিত ও রোগক্লিষ্ট হলে অপরজনও ব্যথা ও রোগযন্ত্রণা অনুভব করে। এভাবে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে যে ছোট্ট সংসারটির সূত্রপাত হয় পরবর্তী পর্যায়ে সেখান থেকেই দায়িত্বশীল সুষ্ঠু সবল সন্তান জন্মলাভ করে। এই সন্তানই আগামী দিনের আদর্শ ছেলে ও মানুষ বলে সমাজে খ্যাতি লাভ করতে পারে।

স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের যেসব গুণ থাকলে আদর্শ স্বামী ও আদর্শ স্ত্রী তথা আমাদের আদর্শ মানুষ বলে গণ্য হতে পারে সেগুলো হচ্ছে :

১। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় ও নিবিড় প্রেম-ভালবাসা।

২। একে অপরের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।

৩। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির অবসান।

www.pathagar.com

৪। একজনের ওপর অপর জনের অধিকারের সাথে একে অপরের প্রতি কর্তব্যের কথাও ভুলে না যাওয়া।

৫। স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভার বহন করার সাথে সাথে স্বামীকে স্ত্রীর ইজ্জত আব্রু ও মান-সম্মান রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা।

৬। জন্মগতভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে নারীপুরুষের চাইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। স্বামীকে একথা মনে রেখে স্ত্রীর প্রয়োজনসমূহ যথাযথ পূরণ করা। ক্ষমা মার্জনার মনোবৃত্তি নিয়ে স্বামীকে স্ত্রীর সাথে বাস করা। শুধুমাত্র স্ত্রীর দোষগুলো না দেখে বরং তার গুণসমূহও স্মরণ রাখা। সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে সন্তান পালন ও সুসন্তান করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব স্ত্রীর ওপর। এই গুরুদায়িত্ব পালন করা স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। অতএব স্বামীকে এ ব্যাপারে স্ত্রীর সহযোগিতা করা।

৭। সুখের সংসার গড়ে তোলার জন্যে এবং এই সংসারে সুসন্তান লাভ করার জন্যেও স্বামীকে একটি জরুরি কথা মনে রাখা দরকার। অন্য এক পরিবার থেকে অপরিচিতা যে নারীটি এসে তার জীবন-সাগরে সহযাত্রী হয়ে ভেসে চলেছে সে নারী চায় তার স্বামী হৃদয় উজাড় করে কেবল তাকেই ভালবাসুক—দুনিয়ার সব মোহমায়ার কেন্দ্রবিন্দু সে-ই হোক। সতী-সাধ্বী নারী এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্বার্থপর স্পর্শকাতর। স্বামীকে পাশে রেখে সে পর্ণকুটীরে বাস করাকেও সুরম্য অট্টালিকায় বাস করার চাইতে শ্রেয় মনে করে। সে এমন স্বামীর কথা চিন্তা করতে পারে না, যে স্বামী সারাদিন জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকে আবার রাতের বেলা হয় ক্লাবে নতুবা অন্য কোথাও রাত্রিযাপন করে। সে অর্ধাহারে থাকতে প্রস্তুত ; কিন্তু তবুও এমন পরিস্থিতি তার অসহ্য। অগাধ অর্থ, দাস-দাসী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ও বাড়ি পেয়েও সে এ পরিস্থিতিতে নিঃস্ব ও অসহায় বোধ করে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তার স্বামী কেবল তাকে কেন্দ্র করেই সুখের নীড় রচনা করেছে। বস্তুত যে পরিবারের পরিবেশ এমনিতর প্রীতিকর ও মধুর সেটাই আদর্শ পরিবার এবং এ পরিবার থেকেই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সুসন্তান আশা করা যায়।

এবার স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দু'একটা কথা। স্ত্রী হচ্ছে ছোট্ট সংসারটির রানী। তার ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, তার আত্মতুষ্টি ও সংযম এবং তার স্বামী-কেন্দ্রিক আত্মোৎসর্গের ওপর নির্ভর করছে এই ছোট্ট সংসারটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। তার মনে রাখতে হবে সেদিনকার কথা, যেদিন তার স্বামী বরণ করে নিল একটি অপরিচিতা নারীকে আপনজন বলে। সেদিন থেকেই এই পুরুষটি নিশ্চিন্ত। কারণ সে এখন এমন এক সহযাত্রী পেয়েছে যাকে নিয়ে সে জীবন সংগ্রামের দুর্গম ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করতেও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। এখন সে এমন এক আপনজন পেয়েছে যার কাছে নিঃসংকোচে হৃদয় উজাড় করে সব কথা বলতে পারে এবং তার জীবনের সব গোপন কথা নির্ভয়ে ব্যক্ত করতে পারে। এই দু'টি প্রাণ একে অপরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচ্ছাদন স্বরূপ। এই

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতাই উভয়কে চলার পথের সর্বপ্রকার ঝড়-তুফান অতিক্রম করে এগুবার হিম্মৎ যোগাবে।

আদর্শ মাতা-পিতা

স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসারটির পরিসর এবার বেড়েছে। তাদের কোলে একটি সদ্যজাত ফুটফুটে কচি মুখের আবির্ভাব হয়েছে। মা-বাবা এই চাঁদমুখ দর্শনে আনন্দে আত্মহারা। এবার তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি আরও বিস্তৃত হলো। দায়িত্ব বেড়ে গেল অনেক বেশি। সযতনে লালন-পালন ছাড়াও এই কচি প্রাণে সঞ্চারিত করতে হবে ভবিষ্যৎ জীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। অতি সাবধানে গড়ে তুলতে হবে এই সদ্যজাত আদরের দুলালকে সোনার সন্তান রূপে। শারীরিক ও মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে যত্ন নিতে হবে দু'জনকেই। এ কাজ অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। পশু-পক্ষীর বাচ্চাতো নয় যে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেখাশোনা করলেই প্রয়োজন শেষ হলো, এরপর পরস্পরের পরিচয়টুকুও মুছে গেল। মানব সমাজে জীবনধারা অন্যরূপ। সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক চিরস্থায়ী। কোন অবস্থাতেই এই সম্পর্ক মুছে যায় না, যেতে পারে না। অবশ্য ঊনবিংশ শতকের শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে মানব প্রকৃতির যে নতুন মূল্যায়ন ঘটেছে তাতে মানব সন্তান ও পশুশাবকের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য স্বীকার করতে রাজী নয় আজকের দুনিয়া। সন্তান বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যখন স্বাবলম্বী হলো তখন সে পৃথক জীবনযাপন করবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকবে পৃথক, সম্পর্ক থাকবে না একে অপরের সাথে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার এটাই শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বতো পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝল্‌মলানিতে আকৃষ্ট হতেই অভ্যস্ত, আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

কিন্তু যে সন্তান সমাজে আদর্শ ছেলে হিসেবে পরিচিত হতে চায় তার মানসিকতা এভাবে গড়ে তুললে চলবে কি ? সমাজ যার ব্যবহারে মুগ্ধ হবে, যার আত্মত্যাগ ও স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শে সমাজের লোক পরিতুষ্ট হবে, সে সন্তান যদি তার জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারণকারিণী মা-কে স্মরণ রাখতে না পারে, তাদের অসহায় অবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়াতে না পারে, তাদের অন্তিম শয্যার পাশে বসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে না পারে, তা'হলে সে সন্তান সমাজের অপর লোকের উপকার করবে কি করে ? কি করে সে দায়িত্ব পালন করবে জনসেবার ? পিতা-মাতার সাথে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার সে প্রদর্শন করলো তা থেকে একথাই প্রমাণিত হবে যে, নিঃস্বার্থ মন নিয়ে সে সমাজের কোন কাজেই আসতে পারে না।

মাতা-পিতাকে তাই অতি সাবধানে তাদের সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে। সোনার ছেলে তৈরি করার স্বর্ণকার হচ্ছেন পিতা ও মাতা। তাদের মনে রাখতে হবে :

www.pathagar.com

শিশুর কাঁচা মন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গড়ে তোলা যায়। কাদা মাটিকে যে কোন আকৃতি দেয়া যায়। এ মাটিতে যে কোন দাগ কাটলে সেটা আর মুছে যায় না। সন্তানের মন কাদা-মাটির মতো। পিতা-মাতার আচার-আচরণের ছাপ ওদের মনে লাগবেই। ওদের মনে পিতা-মাতার চরিত্রের দাগ কাটবেই। এ কারণে পিতা-মাতাকে প্রথমত তাদের (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর) সম্পর্ক রাখতে হবে সু-মধুর, তাদের হতে হবে সহনশীল। দ্বিতীয়ত বাইরের সাথে পিতা-মাতা উভয়কেই সম্পর্ক রাখতে হবে প্রশংসনীয়। তাদের স্বভাব-চরিত্রে কোন প্রকার কলুষ-কালিমা থাকতে পারবে না। সন্তান যেন কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতাকে বাইরের লোকদের সাথে অসদাচরণ করতে না দেখে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ওয়াদা ভঙ্গ, জুলুম, অত্যাচার, কর্তব্যে অবহেলা ইত্যাদি যত প্রকার সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আছে এর কোনটাই পিতা-মাতা করতে পারবে না। এর পরিবর্তে সমাজকল্যাণমূলক কাজ, পরহিতকর কর্মতৎপরতাতে অংশগ্রহণ করতে হবে তাদেরকে। পিতা-মাতার এসব কর্মতৎপরতা দেখে দেখে অজান্তেই এসব গুণাবলী সন্তানের মধ্যে জন্ম লাভ করবে এবং এই সন্তানই পরবর্তীকালে আমাদের সমাজের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ ছেলে হিসেবে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি সন্তানের সামনে চরিত্রহীনতা প্রদর্শন করতে থাকেন তবে সন্তানের চরিত্র সেভাবেই গড়ে উঠবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আদর্শ ছেলে তৈরি করার জন্যে প্রথমত পিতা-মাতাকে হতে হবে আদর্শ মানুষ। তবেই সহজ হবে আদর্শ ছেলে তৈরি করা। সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার সর্বোত্তম উপহার হচ্ছে সদাচার ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেয়া। প্রথমত ও প্রধানত পিতা-মাতাকেই এই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এটা তখনই সম্ভব যখন তারা নিজেরাই সদাচার ও সচ্চরিত্রবান হবেন।

আদর্শ সন্তান

সন্তান—ছেলে হোক অথবা মেয়ে—পিতামাতার অতি আদরের ধন। অতএব, হে আদরের সন্তান! তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার এখন জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। এখন তুমি ভালো-মন্দের তারতম্য করতে পার। তোমার পিতামাতার যৌথ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে তুমি এখন কর্মজীবনের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করেছ। তোমার পিতামাতার আদেশ-উপদেশ ক্ষণিকের জন্যেও বিস্মৃত হইয়ো না। মনে রেখ এই পৃথিবীতে তাঁদের মতো নিঃস্বার্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু আর দ্বিতীয়টি নেই। অনুগত থেক তাদের কাছে। তুমি তাদের ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না—সর্বদা একথা মনে রেখ।

তুমি কি স্মরণ করতে পার ঐ দিনগুলোর কথা, যেদিনগুলোতে তোমার মা-র

www.pathagar.com

জঠরের অন্ধকারে অতি নিরাপদে অবস্থান করছিলে তুমি আর তোমার দৈহিক সুগঠনের জন্যে চুষে চুষে নিঃশেষ করে দিচ্ছিলে তার শরীরের নির্যাস-রক্তবিন্দু ? এ সময় ডাক্তার তোমার মা-কে বলেছে তার এ্যানিমিয়া (Anaemia) রোগ হয়েছে। তোমার কি মনে আছে, বুঝতে পেরেছিলে তুমি, উদরের অন্ধকার কোঠরে তোমার দেহে যখন প্রাণ সঞ্চার হলো তখন তোমার মা-র মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল ? তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-নিদ্রা সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁর দৃষ্টি ছিল একমাত্র তোমারই প্রতি ? তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তোমার মা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতেন। ক্ষণিকের জন্যেও তোমার নাড়ির স্পন্দন বন্ধ হলে অস্থির হয়ে যেতেন তোমার মা। তুমি তখনো এই কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে আসনি। তোমার পিতামাতা তোমার আগমনের পূর্বক্ষণ থেকেই তোমার সম্পর্কে কত কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এই পুরনো পৃথিবীতে তোমার প্রথম শুভাগমনে তোমার অভ্যর্থনার জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থায় তখন দু'জনই সদা ব্যস্ত। তোমার পিতা-মাতা তোমার দৈহিক ও মানসিক উন্নতি কামনা করে বিশ্ব-নিয়ন্তার দরবারে কত যে প্রার্থনা করেছেন, সেকথা কি তুমি শুনেছ ? সুদীর্ঘ দশ মাস দশ দিন তোমার মা তোমাকে উদরে ধারণ করে অশেষ ক্লেশ সহ্য করেছেন। এবার শোন এক ভয়াবহ অচিন্তনীয় ও অবর্ণনীয় মুহূর্তের কথা—সে মুহূর্তের কথা স্মরণ করে আজো তোমার মা-র শরীর শিউরে ওঠে। সে মুহূর্ত হচ্ছে এই পাখি-ডাকা, ফুলে-ভরা, ফলে-ভরা, সসাগরা পৃথিবীর বুকে তোমার শুভাগমনের পূর্বমুহূর্তটি। তুমি হয়ত জান না, তবে শোন। সারা পৃথিবীর যত দুঃখ ও ক্লেশ আছে সব দুঃখ ও ক্লেশ যোগ করে এক দিকে রাখলে আর সে সময় তোমার মা যে ক্লেশ পেয়েছেন তা এক দিকে রাখলে তার ওজন ও ভয়াবহতা অনেক অনেক গুণ বেশি হতো। কিন্তু জান, যখন তুমি ঐ অন্ধ কুঠরী থেকে এই ঝল্‌মলে পৃথিবীতে বেরিয়ে এলে, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষমাণ সবাইর মুখে ফুটলো হাসি—তোমার মা ভুলে গেলেন তার সব যাতনা, সব ব্যথা-বেদনা। তোমার কচিমুখ দর্শনে সবাই উৎফুল্ল—তোমার মা-ও। এই দশ মাস যাবত তোমার মা তোমার বাবা একটা অজানা চিন্তার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন—না জানি তুমি কি ধরনের দেহকাঠামো বেশভূষা নিয়ে আসবে! না জানি তুমি কেমন হবে! কিন্তু আজ সবাই আনন্দে আত্মহারা। তুমি নিখুঁত বেশভূষায় সেজে-গুজে এসে উপস্থিত। কোথাও কোন ক্রটি নেই তোমার দেহভূষণে। তুমি হয়তো জান না, কোটি কোটি মানুষের এই কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীর বুকে তোমার পিতামাতার চোখে আজ একমাত্র তুমিই অতি সুন্দর, সুশ্রী—তুমি একমাত্র আদরের ধন। তুমি হয়তো একথাও জান না, তোমার মুখ দর্শনে তোমার পিতামাতা একটা অনাগত উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখছেন তোমাকে ঘিরে।

তোমার কি মনে আছে ঐ দিনগুলোর কথা যখন তুমি একটি মাটির ঢেলার মতো পড়ে থাকতে, না পারতে কথা বলতে, না পারতে নড়াচড়া করতে ? নিজের

www.pathagar.com

চেষ্টায় না পারতে সামান্যতম প্রয়োজন মেটাতে। কান্না ছাড়া তোমার আর কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। তোমার ব্যথা-বেদনার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তখন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েও কিছুই বলতে পারতে না। তুমি হয়তো প্রস্রাব-পায়খানা করে তারই মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছ, একটু সরে গিয়ে থাকার ক্ষমতাও নেই তোমার। তোমার এহেন অসহায় অবস্থায় তোমার আপনজন কে ছিল ? তুমি অসুস্থ বোধ করলে সারা রাত জেগে যে দুটি প্রাণ তোমার সেবা করেছেন তাদের কথা মনে আছে ? স্মরণ করতে পারছ না ? এখন বড় হয়েছ, স্বাবলম্বী হয়েছ, কর্মজীবনের নানা ঝামেলায় পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে না। তবে শোন। তাঁরা ছিলেন তোমার মা তোমার বাবা। আরো শোন, ঐ দিনগুলোতে তুমি সামান্য অসুস্থ বোধ করলেও, তোমার সামনে আজ যে অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখতে পাচ্ছ, যাঁদেরকে আজ ছোট্ট শিশুর মতো অসহায় মনে হচ্ছে; এঁরাই সেদিন তোমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে উন্মাদের মতো এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতেন। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আজ চোখে কম দেখেন, কানেও কম শোনেন, তাই তো এক একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করেন। তোমার কি সে দিনগুলোর কথা মনে আছে, যখন তুমি ভালো করে কথা বলতে পারতে না? তোমার মুখে তখন আধো আধো বোল। তখন তুমি একটা জিনিস দেখিয়ে বলতে "ওটা কি ?" তোমার মা অথবা বাবা তখন সেটার নাম বলতেন তোমাকে ; কিন্তু তুমি সেটাকেই দেখিয়ে বলতে "ওটা কি ?" আবার উত্তর দেয়া হতো তোমাকে ; কিন্তু তুমি আবার জিজ্ঞেস করতে। এভাবে কতবার যে জিজ্ঞেস করেছ তার হিসেব নেই। প্রতিবারই তোমাকে উত্তর দিতেন তাঁরা ; কিন্তু বিরক্ত হতেন না এতটুকু। আজ তুমি এই শিশু-মনা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ঐ ধরনের আচরণে বিরক্ত বোধ করছ ?

একটা মজার কথা শুনবে ? তুমি তো বেশ বড় হয়েছ। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। এখন তুমি নিজের ভালো-মন্দ, আরাম-আয়েস সম্পর্কে সদা সতর্ক। তুমি এখন সব কিছু বোঝ এবং জান, একথা তুমিও বোঝ অপর দশজনও স্বীকার করে ; কিন্তু এমন দু'টি প্রাণ আছে যারা একথা স্বীকার করেন না যে, তুমি সব কিছু বোঝ। তাঁরা বলেন, "আমাদের খোকা কিচ্ছু বোঝে না। খাওয়া-পরা একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে করবে তা-ও সে পারে না"। তাঁরা কিন্তু তোমাকে এখনো ছোট্ট কচি শিশু মনে করছেন, তাঁরা তোমাকে সেই আগের চোখ দিয়েই দেখছেন—অকৃত্রিম ও অসীম স্নেহ এখনো তাদের মনে তোমার জন্যে, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।

এবার বল, পিতা তাঁর রক্ত পানি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মা তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে তোমাকে লালন-পালন করলেন—কিসের আকর্ষণে, কি উদ্দেশ্যে ? তুমি বড় হয়ে তাঁদের সেবা-যত্ন করবে এই উদ্দেশ্যে ? না, এ ধরনের

www.pathagar.com

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমাকে লালন-পালন করেন নি। তাঁদের একটা মাত্র অভিপ্রায়—তুমি আদর্শ ছেলে হিসেবে পরিচিত হও। সমাজে আদর্শ মানুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ কর। লোক তোমাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করুক। লোক-মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনতে পেলেই তাঁদের হৃদয় শীতল হবে। সার্থক মনে করবেন তাঁরা তাঁদের আত্মত্যাগ।

তুমি আজ জ্ঞান বুদ্ধিতে পরিপক্ক হয়েছ। আজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সদাজাগ্রত থাকা প্রয়োজন তোমার। আদর্শ সন্তান হিসেবে আজ তোমার কর্তব্য হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। কোন অবস্থাতেই তাঁদের মনে আঘাত না দেয়া। তাঁদের সামনে বিনয়াবনত হয়ে থাকা। তাদের যাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তাঁদের আদেশ-নিষেধসমূহ আন্তরিকতার সাথে পালন করা। মনে রেখ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত থেকে কর্তব্য পালনের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক সৎ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সন্তানের অবশ্য কর্তব্য কাজ। ছোটবেলায় তোমার পিতা-মাতা যেরূপ স্নেহ-মমতার সাথে তোমাকে লালন-পালন করেছেন সেকথা মনে রেখে স্রষ্টার কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করে বলা উচিত : হে বিশ্বপালক! বাবা-মা আমাকে যেরূপ আদর-যত্ন করে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন তুমি তাঁদের প্রতি সেরূপ সদয় হও। তুমি আরো মনে রেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাদের সাথেও তোমাকে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের সুখে-দুঃখে তোমাকে শরিক হতে হবে। তোমার সাধ্যানুসারে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্যে সচেষ্ট থাকতে হবে, তবেই তো তুমি আদর্শ সন্তান হিসেবে সবার প্রিয় হতে পারবে।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন

আদর্শ শিক্ষক

সমাজের চাহিদা, দেশের চাহিদা ও সারা জাতির চাহিদা বিরাট ; কিন্তু এই অগণিত চাহিদার মধ্যে মাত্র একটি চাহিদা সর্ববৃহৎ। সমাজের প্রতি স্তরে ও প্রত্যেক জায়গায় সৎ, সাধু ও ভালো মানুষের চাহিদা—আদর্শ মানুষের চাহিদা। কিন্তু আদর্শ মানুষ তৈরি করার কোন কারখানা নেই যে, অর্ডার দেয়ার সাথে সাথে মেশিন চালু করে দিলে হুড় হুড় করে আদর্শ মানুষ বেরিয়ে আসবে এবং তাদেরকে সমাজের বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে দিলে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, দূর হয়ে যাবে সমাজ-দেহের সব গ্লানি। এমন কোন দেশও নেই যেখান থেকে বিদেশী মুদ্রায় আদর্শ মানুষ আমদানি করে কাজে লাগানো যাবে। নিজের দেশেই আদর্শ মানুষ তৈরি করার সুযোগ্য ও সুনিপুণ কারিগর প্রয়োজন। প্রয়োজন এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে দায়িত্বশীল শিক্ষক। শৈশব থেকে শুরু করে কর্ম জীবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এ সময়টা হচ্ছে প্রত্যেক সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের যোগ্যতা অর্জনের সময়। এই সময়ের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি সন্তানকে শিখে নিতে হবে কি করে এবং কিভাবে সে ভবিষ্যৎ জীবনযাপন করবে। এই প্রস্তুতি পর্বে যিনি তাকে সাহায্য করবেন তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। অতএব শিক্ষককে সর্বদা তাঁর এই গুরুদায়িত্ব মনে রাখতে হবে। দেশের প্রত্যেকটি সন্তান জাতির সম্পদ। জাতির কোন না-কোন কাজে সে অবশ্যই লাগবে। অতএব শিক্ষার প্রথম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যারা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকতার পবিত্র আমানত নিয়ে বসে আছেন, তাঁদের উপর নির্ভর করছে আদর্শ ছেলে তৈরির দায়িত্ব, আদর্শ মানুষ গড়ার কর্তব্য।

আজ শিক্ষার্থী যে শিক্ষা লাভ করছে তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী। শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম। আজকের শিক্ষা সুষ্ঠু হলে, শিক্ষাদান পদ্ধতি নিখুঁত হলে এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে নিজেও উপকৃত হতে পারবে এবং সমাজও উপকৃত হবে। শিক্ষাগারের এই পবিত্র অঙ্গনে শিক্ষার্থী দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করবে। দৈহিক উন্নতি দেহের চাহিদার তাগিদেই স্বাভাবিক নিয়মে সাধিত হয় ; কিন্তু মানসিক উন্নতি সেভাবে হয় না। বিশেষ করে কচি মনে বাইরের ছাপ না লাগলে, এতে বাইরের আলোচ্ছটা না

www.pathagar.com

পড়লে সে মন আলোকিত হয় না। আর এই আলো দান করেন শিক্ষক। শিক্ষক তাঁর ছাত্রের নির্মল মানসপটে যে দাগ কাটেন সে দাগ সহজে মুছে যায় না। অতএব শিক্ষককে অতি সতর্কতার সাথে শিক্ষাদানের কাজ করতে হয়।

একটি শিশু অথবা একটি যুবককে আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন শিক্ষক। তাঁকে মনে রাখতে হবে, শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন হয় না। এ কাজের জন্যে শিক্ষকের আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন সর্বাধিক। নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ছাড়া কোন মানুষের জীবনেই মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। মানুষের জীবনের মহামূল্য সম্পদ হচ্ছে সচ্চরিত্র। চরিত্র গুণেই এই পৃথিবীতে মানুষ সম্মান পায় আর চরিত্রবান লোকের অভাবে সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ চরিত্রের লোককেই আমরা আদর্শ মানুষ আখ্যা দেই। এই চরিত্র গঠনে শিক্ষকমণ্ডলীর বিরাট দায়িত্ব। সর্বপ্রথম শিক্ষককেই নিখুঁত চরিত্রের হতে হবে। তবেই তিনি তাঁর শিক্ষার্থীকে চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। শুধু আদেশ-উপদেশ নয় বরং বলিষ্ঠ চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেই শিক্ষক তাঁর ছাত্রের নিখুঁত-নির্মল চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Example is better than precepst. অর্থাৎ উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্তই শিক্ষার উত্তম পন্থা।

আদর্শ মানুষ তৈরি করার জন্যে আদর্শ শিক্ষকের যেসব গুণাবলী প্রয়োজন তা হলো—

১। শিক্ষা দানের মহান দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁকে সচেতন থাকতে হবে সব সময়।

২। শিক্ষার্থীর জন্যে তাঁর মনে থাকবে স্নেহ ও মমত্ববোধ এবং তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি শুধু শিক্ষকই নন; তিনি স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতাও বটে। জাতি গঠনের গুরুদায়িত্ব বহন করছেন তিনি। তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত হবে।

৩। শিক্ষাগারের বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুনের বাইরেও শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক রাখবেন তিনি।

৪। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা যাচাই করে শিক্ষা দানের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।

৫। পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা সাধনে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৬। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে শিক্ষার্থীর মনোভাব সৃষ্টি করবেন।

৭। সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আইনানুগ নাগরিক জীবনযাপনের জন্যে অভ্যস্ত করে তুলবেন শিক্ষার্থীকে। দৃঢ়তার সাথে নিয়ম-

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা মেনে না চললে কি ব্যক্তি-জীবন, কি জাতীয়-জীবন কোনটাই সমুন্নত হতে পারে না এ ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল করে তুলবেন শিক্ষক।

আদর্শ ছাত্র

তুমি ছাত্র—তুমি শিক্ষার্থী। তোমার জীবন চিন্তামুক্ত। খাওয়া-পরা কোন কিছুর দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত করে না তোমার মন। এ চিন্তার ভার বহন করছেন তোমার পিতা-মাতা, তোমার অভিভাবক। তুমি যাতে মুক্ত মন নিয়ে তোমার শিক্ষা জীবন কাটাতে পার আর অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে পার তার ব্যবস্থা করতে তাঁরা সদা ব্যস্ত ; কিন্তু এর প্রতিদানে তোমার কাছে তাঁরা শুধু একটা জিনিস চান। সেটা হচ্ছে : তুমি দেশের ও সমাজের জন্যে সুযোগ্য মানুষ হয়ে এই কর্মমুখর জীবনে বেরিয়ে আস—তোমাকে পেয়ে দেশ হোক ধন্য, উপকৃত হোক সমাজ। তোমার ওপর সমাজের সর্বস্তরের লোক যেন নির্ভর করতে পারে। তোমার সততা ও সচ্চরিত্রে যেন বিমুগ্ধ হতে পারে প্রতিটি মানুষ। অতএব অতি সাবধানে আজ তোমাকে গড়ে উঠতে হবে। শিক্ষার্থী হিসেবে আজ তুমি যে শিক্ষা গ্রহণ করবে তোমার কর্মময় জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটবে। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে তুমি আজ যে মানসিকতার অনুশীলন করবে কাল তোমার মাঝে সে মানসিকতাই দেখতে পাবে সমাজ। আজ তুমি যদি হও সুশৃঙ্খল কাল তুমি উচ্ছৃঙ্খল হবে না। আজ যদি তুমি হও কঠোর পরিশ্রমী কাল তুমি অলস হতে পারবে না। আজ দৈনন্দিন কর্মতৎপরতায় তুমি যদি পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হও, কাল তোমার কর্মজীবন অগোছাল হবে না। আজ যদি তুমি শিক্ষাগারের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলতে থাক, কাল তুমি নিজেও আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে না এবং অপরকেও আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার শেষ সীমা পর্যন্ত যারা অধ্যয়নরত তাদের প্রতি শুধু তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনই নন বরং সারা দেশ চেয়ে আছে। শিক্ষা জীবন শেষ করে তারা দেশের উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্তব্য পালন করবে, তাদের সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণ এ আশাই পোষণ করছে। তারা আশা করছে অধ্যয়নরত দেশের প্রতিটি সন্তান হবে এক একটি রত্ন—সোনার ছেলে। তারা কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলে সমাজে আদর্শ মানুষ হিসেবেই আসবে।

অতএব মনে রেখ, দেশের প্রতিটি লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার এই সুর প্রতিনিয়ত শিক্ষা অঙ্গনে তোমাদের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে বলছে : তোমরা সুস্থ থাক, সবল হয়ে ওঠ। তোমরা দেশের সুযোগ্য সন্তান হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে এস। তোমরা নির্মল চরিত্র গঠন করে আদর্শ ছেলে হয়ে আমাদের আশা পূরণ কর। তোমরা সমাজ সেবার সুমহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাদেরকে

www.pathagar.com

সুমহান জাতি হিসেবে গড়ে তোল।

শিক্ষার্থী তথা ছাত্রসমাজকে দেশবাসীর এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে শিক্ষালাভের এই সুযোগ থেকে। দেশবাসীর আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে ছাত্র সমাজকে নির্মল চরিত্র ও সুশৃঙ্খল আচার-আচরণের মাধুর্য দ্বারা।

আদর্শ সাহিত্যিক

সাহিত্যসেবীরা সাধারণত দ্বিমুখী কর্মসূচী সামনে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। একজন সাহিত্যিক প্রথমত বর্তমান সমাজের অবিকল চিত্র তুলে ধরেন তাঁর কলমের তুলিতে। দ্বিতীয়ত সমাজের কোথায় কি গলদ আছে তার পর্যালোচনা করে প্রতিকার বাতলে দেন তাঁর লেখনীর সাহায্যে। এ দু'টো কাজই অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের জন্যে সাহিত্যিককে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে অবলোকন করতে হয় সমাজের ক্রিয়াকলাপ।

বস্তুত সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজকল্যাণ। সাহিত্য হওয়া উচিত সার্বজনীন। সমাজের প্রত্যেকটি লোক যাতে সাহিত্যের মারফত উপকৃত হতে পারে তার প্রতি নজর রেখে সাহিত্য রচনা করা কর্তব্য। একটা বিশেষ শ্রেণীকে সামনে রেখে এবং একটা বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে আর অপর এক শ্রেণীর বিপক্ষে সাহিত্য রচনা করলে সেটা সার্থক রচনা হবে না। সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা সমঝোতার ভাব সৃষ্টি করতে হবে, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে। এই কর্মবহুল পৃথিবীতে প্রত্যেকের কিছু করণীয় আছে, আবার প্রত্যেকেরই রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করার অধিকার। অতএব বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের মনে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে তার মধ্যে জুলুম, অত্যাচার ও শোষণের পরিবর্তে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতির মনোভাব অবশ্যই সৃষ্টি হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা শোষক ও অত্যাচারী, অন্যায় ও অসচ্চরিত্র যাদের পেশা ও নেশা, সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তাদের মনে যদি জুলুম ও শোষণ এবং অন্যায় ও অসচ্চরিত্রের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা যায়, তা'হলে তারা অবশ্যই এই ঘৃণিত কাজ বর্জন করবে এবং এর পরিবর্তে সহৃদয়তা ও সহযোগিতার কোমল হাত বাড়াবে সমাজের প্রতি। এই পর্যায়ে একজন সুসাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারকও বটে।

আরাম কেদারার সুসাহিত্য যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক এবং দর্শন শাস্ত্রের জটিলতায় পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, সেটা সার্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে অক্ষম। সেটা শ্রেণী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যিক একজন শিক্ষকও বটে ; কিন্তু শিক্ষক বলতে আমরা যা বুঝি সাহিত্যিক সে ধরনের শিক্ষক নন। সাধারণ শিক্ষক তাঁর শিক্ষাগারের

www.pathagar.com

চতুঃসীমানার মধ্যে শিক্ষাদান করেন ; কিন্তু সাহিত্যিকের শিক্ষাগার বিরাট, বিস্তৃত তার সীমা। সাহিত্যিকের রচনা সমাজের প্রতিটি লোকের হাতে পৌছায় আর এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় প্রত্যেকটি মানুষ। দেশের বাইরেও সাহিত্যিকের চাহিদা অপরিসীম।

সাহিত্যিকের রচনা হবে গঠনমূলক। তাতে থাকবে মানব মনের সব গ্লানি ও পঙ্কিলতা দূর করে স্বচ্ছ-সুন্দর মন তৈরি করার সামগ্রী। জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে সাহিত্যিক যদি গোটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কল্যাণমুখী করে তুলতে পারেন, যদি পারেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নৈতিক চরিত্রে তবেই তাঁর সাহিত্য রচনা সার্থক হবে। এই রচনার অমর বাণী সমাজে তৈরি করবে নিঃস্বার্থ কর্মী—বলিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শ মানুষ। অতএব সর্বপ্রথম সাহিত্যিক আদর্শবাদী মন নিয়ে রচনা করবেন তাঁর মহামূল্য সাহিত্য, যার পরশ লেগে পাঠকবৃন্দ আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত হবে আর উপকৃত হবে সর্ব যুগের ও সর্ব দেশের মানুষ।

•

আদর্শ বৈজ্ঞানিক

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে মানুষ গৌরবান্বিত। মানুষ চায় বিজ্ঞান আরো এগিয়ে যাক, অজানাকে জানবার ও বুঝবার আরো পথ ও পন্থা আবিষ্কার করুক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা জটিল প্রশ্ন এসে পড়ে, যার সঠিক জবাব অত্যন্ত জরুরি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি শুধু মানব-কল্যাণের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে, না গোটা মানব-সমাজকে ধ্বংসের দিকেও ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ? সারা পৃথিবী আজ এমন এক বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে যে, যে-কোন মুহূর্তে বিশ্ব-মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এর জন্যে দায়ী কে—বিজ্ঞানী না বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে যারা কাজে লাগাচ্ছে তারা ? যদি বলা হয় উভয়ে, তাহলে কি ভুল হবে ? অবৈজ্ঞানিকদের আচার-আচরণই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ধ্বংসের কাজে লাগাবার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ; কিন্তু পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানীরাও এজন্যে কম দায়ী নন। বস্তুত এই ধ্বংসাত্মক কাজে বাধা দিতে পারেন একমাত্র বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যদি সত্যিকারের মানব কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞান চর্চা করার দাবি করেন, তাহলে বিশ্ববাসীকে প্রথমেই বলে দেয়া উচিত যে, ধ্বংসাত্মক কাজে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যবহার করার সামান্যতম লক্ষণ দেখতে পেলেই তারা বিজ্ঞান চর্চা থেকে হাত গুটাবেন। কি হবে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ? এই আবিষ্কার যদি মানব সমাজের উপকারে না-ই এলো তবে কি হবে এর পেছনে মস্তিষ্ক খাটিয়ে ? ধ্বংসের কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহারের পেছনে বৈজ্ঞানিকদের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে, একথা কি অবান্তর, অযৌক্তিক ?

পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ১৯৫৪ সালে

www.pathagar.com

প্রশান্ত মহাসাগরের জনমানবহীন দ্বীপ বিকিনিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণের মারাত্মক কুফল নিকটবর্তী মার্শাল দ্বীপপুঞ্জবাসীদের দেহের ওপর এখনো দেখা যাচ্ছে বলে জানা গেছে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের যেসব নর-নারী সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বিকিনি দ্বীপ থেকে প্রবাহিত আণবিক তেজস্ক্রিয় ভস্মমিশ্রিত বায়ুর সম্মুখীন হয় তাদের প্রত্যেকেই অস্থি রোগ, গর্ভপাত, ক্যান্সার প্রভৃতি নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে আক্রান্ত হয়েছে। এই তত্ত্ব মার্কিন মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির কথা বিশ্ববাসী কোন দিন ভুলতে পারবে না। এই অপরাধমূলক কাজের জন্যে দায়ী কে ? আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সাজিয়ে যারা ওঁৎ পেতে বসে আছে নিমেষের মধ্যে মানব সভ্যতা বিলীন করে দেয়ার জন্যে, তাদের এই কুকীর্তির জন্যে দায়ী কে ?

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ধ্বংসযজ্ঞে যারা আত্মাহুতি দিল, হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে যাদের পাঁজর ঝাঁঝরা হয়ে গেল, তাদের এই করুণ অবস্থা দৃষ্টে যারা উল্লাসে ফেটে পড়ে, অট্টহাসিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে, তারা মানবতার শত্রু, তারা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আরো নিকৃষ্ট জীব। এরা বর্বর যুগের অসভ্য (?) আদিম অধিবাসীদের চাইতে অনেক অনেক নিম্নমানের জীব। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি-কাটাকাটি আদিকালেও ছিল ; কিন্তু সেটা ছিল সীমিত গণ্ডির মধ্যে, ক্ষয়-ক্ষতি ছিল অতি নগণ্য, আর আজ ? আজ চোখের পলকে এক একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে।

এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীদের কি করণীয় আছে কিছু ? তাঁদের করণীয় তাঁরাই নির্ধারণ করবেন ; কিন্তু বিশ্বমানব সুখ-শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়। এই বাঁচা-মরার সাথে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত। তাঁরা কি শুধু নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেই কর্তব্য সমাধা করবেন, না মৃত্যুর দুয়ারে আজ যে মানবতা সমুপস্থিত, তাকে বাঁচাবার পথ ও পন্থা আবিষ্কার করার মনোবল নিয়েও এগুবেন ? যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের কল্যাণ করতে অপারগ, সে বিজ্ঞান চর্চা পরিত্যাগ করাই মানব-কল্যাণ। বিজ্ঞানীদের এই মনোবল আয়ত্ত করতেই হবে। মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান চর্চাই শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য। এরূপ গুণসম্পন্ন বিজ্ঞানীকেই সমাজ আদর্শ মানুষ আখ্যা দেবে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাদেরকে আজ এবং চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তারা কালও।

আদর্শ ডাক্তার

কোন মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের আবশ্যক। রোগীকে নিরাময় করে তুলতে হলে ডাক্তারকে দু'প্রকার চিকিৎসা করতে হয়—শারীরিক ও মানসিক। আসলে রোগী

www.pathagar.com

শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পীড়ায়ই আক্রান্ত। রোগীর শরীরে যেরূপ রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয়েছে তার মনের নিভৃত কোণেও সে রোগের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া শুরু হয়েছে। রোগ এমন কিছু মারাত্মক না হলেও রোগী কিন্তু সেটাকে মারাত্মক মনে করে বসে আছে। সে মনে করছে তার এ রোগ আর সারবে না। সে বোধ হয় এ রোগে মারা যাবে। ডাক্তারকে প্রথমত এই মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে হবে তার সহানুভূতি ও আন্তরিকতার দাওয়াই প্রয়োগ করে। এমন কি রোগ যদি মারাত্মক হয় ডাক্তারকে সেটা হাল্কা করে বলতে হবে রোগীর সামনে। রোগীকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হবে, অল্প দিনের মধ্যে রোগী সেরে উঠবে। আরো দশটা রোগীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে হবে যে, রোগ এমন কিছু মারাত্মক নয়। ডাক্তারকে অতি যত্ন সহকারে রোগীকে পরীক্ষা করতে হবে, তন্ন তন্ন করে খোঁজ-খবর নিতে হবে রোগের সূত্রপাত হলো কি করে। ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সাথে এ কাজ করলে রোগী ডাক্তারকে আন্তরিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এভাবে রোগের অর্ধেকটা ওষুধ ছাড়াই কমে যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অবশিষ্ট অংশের জন্যে হয়তো ওষুধের প্রয়োজন হবে।

স্বাস্থ্যই অতি মূল্যবান সম্পদ। এটা ব্যক্তির জন্যে যেমনি প্রয়োজন একটা জাতির জন্যেও তেমনি প্রয়োজন। আর ব্যক্তি সমষ্টির নামই তো জাতি। অতএব এই জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্ধন জরুরি ভিত্তিক কাজ। এই কাজের দায়িত্ব প্রথমত ও প্রধানত ডাক্তারকেই বহন করতে হয়। চিকিৎসাকে শুধুমাত্র একটা ব্যবসা হিসেবে গণ্য করলে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। জনসেবা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। ডাক্তারের চিকিৎসা জনসেবার অন্তর্ভুক্ত বরং আরো মূল্যবান। ডাক্তারের সেবা হচ্ছে আর্তের সেবা, মানবতার সেবা, অসহায়-হতাশাগ্রস্তের সেবা। ডাক্তার রোগীকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে টেনে নিয়ে আসে কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে—এ যেন যমদূতের সাথে পাঞ্জার লড়াই। অতএব ডাক্তারকে তার এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হবে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে। সকল প্রকার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে এ কাজ করতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি লোক তাঁকে দেখলে যেন মনে করতে পারে বিপদের বন্ধু, হতাশাগ্রস্তের তিনি একনিষ্ঠ সেবক ও দরদী। ব্যক্তি ও জাতির জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই মানুষকেই আদর্শ মানুষ বলা হয়।

আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার

কৌশলগত কাজে পারদর্শী ব্যক্তিকে আমরা প্রকৌশলী বলি। স্বল্প পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়ে অধিক লাভ ও নিখুঁত প্রতিফল পাবার কৌশলগত দিকটাই একজন ইঞ্জিনিয়ার সম্পন্ন করেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনযাপনকে করেছে সহজ ও আরামদায়ক। মানব সভ্যতার এই অগ্রগতিকে প্রকৌশলীদের সুষ্ঠু

www.pathagar.com

পরিকল্পনা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত শ্রমের প্রয়োজন। উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতির পেছনে প্রকৌশলীদের অবদান অসাধারণ। সেসব দেশে ইঞ্জিনিয়ারগণ শুধু পরিকল্পনা তৈরি করেই দায়িত্ব শেষ করেন না, একজন সাধারণ শ্রমিকের মতো নিজেও পরিশ্রম করে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। এভাবে স্বল্প পরিশ্রম এবং সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কার্যকরী করার সর্বময় দায়িত্ব নেন প্রকৌশলী নিজে।

একজন প্রকৌশলীকে নতুন নতুন আবিষ্কার দ্বারা জাতিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব বহন করা উচিত। প্রকৌশলী যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন করলে জাতীয় জীবন উন্নত হবে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে জাতির জীবনে এবং প্রকৌশলী নিজেও আনন্দ পাবেন—জাতি অবশ্যই এই ইঞ্জিনিয়ারকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করবে এবং আদর্শ মানুষ হিসেবেই বরণ করবে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক জীবন

আদর্শ কৃষক

ঐ দূর আকাশের সূর্য দুনিয়ার মানুষকে কিরণ বিলাতে কার্পণ্য করে না। মেঘরাশিও বারি বর্ষণে কুণ্ঠিত নয়। এদিকে উর্বর ভূমি তার বক্ষে বীজ ধারণ করে চুপ মেরে বসে থাকে না। বস্তুত বিশ্বপ্রকৃতির সবাই উদার। এই মাটির বুকে যে প্রাণীকুল বাস করে এদের সবার প্রতি প্রকৃতি জগত অত্যন্ত উদার—সদাব্যস্ত এদের সেবায়। এদের জন্যে সকল সম্পদ উজাড় করে দিতে প্রকৃতির দ্বার সদউন্মুক্ত। জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ মানব গোষ্ঠী এই সম্পদ আহরণ করে ভোগ করতে চাইলে অনায়াসেই তা করতে পারে ; কিন্তু এই সম্পদ নিজে নিজেই কারোর ঘরের আঙ্গিনায় এসে উঠবে না। শ্রম-সাধনা লাগবে এটাকে আয়ত্ত করতে। যে যত বেশি পরিশ্রম করবে সে তত বেশি সম্পদশালী হবে। যে জাতি যত বেশি কর্মব্যস্ত হবে সে জাতি তত বেশি সম্পদের মালিক হতে পারবে।

একজন কৃষকের বেলায়ও প্রকৃতির এই নিয়ম। যে কৃষক বিরামহীন প্রচেষ্টার দ্বারা মাটির বুক চিরে সোনা আহরণ করতে চাইবে, মাটি তাকে তত বেশি সোনার খনি উপহার দেবে। যে কৃষক যতটুকু পরিশ্রম করবে সে ততটুকু সোনার ফসল ঘরে তুলতে পারবে। বঞ্চিত হবে না এতটুকু। পিতৃতুল্য আদর-যত্ন সহকারে কচি চারাগুলোকে সবল সুস্থ করে তুলতে হবে কৃষককে। এগুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে—আগাছাগুলো নির্মূল করতে হবে। ভূমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পেলে তাকে জোরালো করতে হবে সার প্রদান করে। এভাবে বিরামহীন সাধ্য-সাধনা দ্বারা ভূমিতে ফলাতে হবে সোনার ফসল। তবেই তো কৃষক আদর্শ কৃষক বলে আখ্যা পেতে পারবে এবং পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বাঁচতে পারবে। এতে কেবল কৃষকের নিজেরই আনন্দ নয়, এতে সারা দেশও সবুজ-শ্যামল রূপ ধারণ করবে, দেশের প্রতিটি মানুষ ঋণী থাকবে এই কঠোর পরিশ্রমী কৃষকের কাছে।

একটি দেশের কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যই প্রধান। সারা দেশের খাদ্য-চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব কৃষকদের। সারা দেশ তথা সারা জাতি কৃষকদের কাছে সেজন্যে অত্যন্ত ঋণী ; কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশে কৃষকদের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করার কারণে তারা অবহেলিত। এসব

www.pathagar.com

দেশের কৃষকরা সহজ-সরল ও নিরীহ—অবহেলার কারণ বোধ হয় এটাই। আসলে মাটির বুক খুঁড়ে কৃষকরা সোনার ফসল ফলায়—প্রকৃত সোনার মানুষ এই কৃষকরাই। দেশবাসীর কাছে কৃষকরা যথোপযুক্ত মর্যাদা পেলে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যে সোনার ফসল তারা ফলায় তার উপযুক্ত মূল্য পেলে, সোনার মানুষ হিসেবে তারা আরো সোনা ফলাবার উৎসাহ পাবে।

আদর্শ শ্রমিক

আধুনিক যুগ শিল্প-বাণিজ্যের যুগ। এ যুগ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতারও যুগ। বর্তমান বিশ্বে শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রণী জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বাধিক। একটি ক্ষুদ্র দেশও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারলে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বিরাট দেশের চাইতেও শক্তিশালী বলে বিবেচিত ; কিন্তু শিল্পোন্নতির দায়িত্ব প্রধানত শ্রমিকদের ওপর। শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমই শিল্পোৎপাদন বাড়াতে সক্ষম। অধিক পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেই দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থ ও খ্যাতি দু'টোই অর্জন করা সম্ভব। একমাত্র উন্নত মানের শিল্প দ্রব্যই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিদেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার শিল্পায়নের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। দেশ সবদিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হলে দেশের শ্রমিক শ্রেণীও তার অংশ পাবে এবং তারাও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল শ্রেণীর শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। দেশপ্রেমের মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিটি শ্রমিক কাজ করলে সে তার শ্রমের পুরস্কার অবশ্যই পাবে এবং আদর্শ শ্রমিক হিসেবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে শ্রমিকদের একটি অতি জরুরি কথা মনে রাখতে হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যেসব সরঞ্জাম রয়েছে সেসব সরঞ্জামের সাহায্যেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। এর কোন একটা অংশ নষ্ট হলে কিংবা খোয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়ে পড়বে, একথা সকলেরই জানা। বস্তুত শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকলেই শ্রমিকের লাভ। এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকের রুজি-রুটির ভার বহন করছে। অতএব প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি অংশ শ্রমিকদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুল্য। প্রত্যেকটি শ্রমিককে এই সাজ-সরঞ্জামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং অতি যত্ন সহকারে এগুলো ব্যবহার করতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ পালিত হলে দেখা যাবে তারা স্বভাবের দিক দিয়ে অত্যন্ত সরল ও কর্মঠ—যদি না বাইরের কোন অবাঞ্ছিত লোক এসে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে। দেশের আইন-কানুন এবং সর্বোপরি মিল-কারখানার পরিচালকদের দূরদৃষ্টি এবং সহানুভূতিশীল আচরণ

www.pathagar.com

শ্রমিকদেরকে আদর্শ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আদর্শ ব্যবসায়ী

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। ব্যবসা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী ব্যবসায়ীর কাছে একটা আমানত। দেশের সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতির সাথে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গোটা অর্থনীতি আবর্তিত হয়। অতএব ব্যবসায়ী মহলের হাতে গোটা দেশের অর্থনীতির চাবিকাঠি রয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এই বণিকগোষ্ঠী ইচ্ছা করলে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে হেস্তনেস্ত করতেও সক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জাতির সেবক। জাতির বৃহত্তম স্বার্থরক্ষাকারী এই বণিক সমাজ। শুধু দেশেই নয়, বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনেও এই ব্যবসায়ী মহলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে সাথে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ সহজ ও ত্বরান্বিত হওয়ার কারণে মানুষের চাহিদা বেড়েছে অনেক। আগে যেসব দ্রব্য বিলাসদ্রব্য বলে পরিগণিত হতো এখন সেগুলো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকায় স্থান নিয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এ চাহিদার গণ্ডি বেড়েই চলছে। মানুষের এই দুর্নিবার চাহিদা মিটাবার পথ কি ? দেশের প্রত্যেকটি লোক নিজে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করতে পারে না এবং দেশের ও বিশ্বের নিভৃত কোণ থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে আনতেও পারে না। এই জটিল কাজটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সম্পন্ন করে থাকেন। একজন ব্যবসায়ী বিদেশের বাজার থেকে এবং দেশের আনাচে-কানাচে থেকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে এনে সেগুলো সরবরাহ করেন, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, কাঁচামাল, পণ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির কাজও তারাই করেন। বিদেশের বাজারের চাহিদার খোঁজ-খবর এবং চাহিদা বাড়ানোর কাজ এই ব্যবসায়ী মহলই করে থাকেন। এভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একদিকে দেশের বাজারের চাহিদা মেটান আবার বিদেশী মুদ্রা অর্জনের কাজেও সাহায্য করেন। এই উভয় কাজই জাতীয় স্বার্থে সম্পন্ন করা হয়। অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ী মহল মূলত দেশের তথা জাতির সেবায় নিয়োজিত।

এই তো গেল ব্যবসায়ীদের জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রম-সাধনার এক দিক। এবার দেখা যাক এ কাজ জনকল্যাণমূলক ও জনহিতকর হিসেবে পরিণত করার জন্যে ব্যবসায়ী মহলকে কি ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত এবং কি কি দুর্নীতি বর্জন করা অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

অনুসরণীয় নীতিমালা

১। দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে। মূল্য জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতে হবে।

২। বাজারে উৎকৃষ্ট মাল সরবরাহে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য বাজারে চালু রাখতে হবে।

৪। ওজন ও মাপে জিনিস ঠিক ঠিক দিতে হবে এবং নিতে হবে।

৫। পণ্যদ্রব্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে খরিদ্দারকে তা বলে দিতে হবে।

৬। খরিদ্দারের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

বর্জনীয় দোষত্রুটি

১। কোন অবস্থাতেই মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

২। মিথ্যা কসম করে গ্রাহককে ঠকানো যাবে না।

৩। কোন দ্রব্যে ভেজাল সরবরাহ করা যাবে না।

৪। কালোবাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা যাবে না।

৫। অধিক মূল্য দাবি করা যাবে না।

৬। দেশের কোন দ্রব্য চোরাচালান করা যাবে না।

৭। জনসাধারণের চরিত্র-বিধ্বংসী কোন প্রকার ব্যবসা করা যাবে না।

৮। ক্রেতার সাথে যে চুক্তি করা হয়েছে তার কোন শর্ত লঙ্ঘন করা যাবে না।

৯। অধিক মূল্য পাবার আশায় পণ্যদ্রব্য মজুদ রাখা যাবে না।

১০। প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য দেশে মজুদ থাকা সত্ত্বেও বিদেশের মাল আমদানি করা যাবে না।

একটু লক্ষ করলে সহজেই বুঝা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উপরোল্লিখিত নীতিমালার সুফল এবং বর্জনীয় দোষত্রুটিগুলোর কুফল সুদূর প্রসারী। অতএব ব্যবসায়ী মহলকে সেবার মনোভাব নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। সৎ ও সাধু ব্যবসায়ী অবশ্যই তার সততা ও সাধুতার সুফল ভোগ করতে পারবেন এবং জনসাধারণের কাছে খ্যাতি লাভ করতে পারবেন আদর্শ ব্যবসায়ী হিসেবে।

যেসব লোকের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় অপর কিছু সংখ্যক লোক কাজ করে, সে ধরনের পরিচালকদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ব্যক্তি পরিচালনায় পরিচালিত কল-কারখানার মালিক অথবা রাষ্ট্র পরিচালিত কলকারখানার মহাপরিচালক এরা সবাই মালিক। এই মালিকদের গুণাবলী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস দেয়ার উদ্দেশ্যে এই আলোচনার অবতারণা।

www.pathagar.com

দেশকে সমৃদ্ধশালী করার জন্যে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অত্যাবশ্যক একথা একটু আগেই বলা হয়েছে। মিল-কারখানায় দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্যদ্রব্য বাজারজাত করা দেশকে শিল্পায়িত করার উপযুক্ত পন্থা ; কিন্তু এসব কাজ মিল-কারখানার মালিকরা করেন না। শ্রমিকরাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং শরীরের রক্ত পানি করে এ কাজ সম্পন্ন করেন। এই অবদান মূলত শ্রমিকদের বলা যেতে পারে। অবশ্য মালিকের বুদ্ধি-বিবেচনা, প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও এ কাজে অতীব প্রয়োজন। মালিককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরের আপোসমূলক মনোভাব না থাকলে মিল-কারখানা চলতে পারে না। একদিকে মালিককে হতে হবে সহানুভূতিশীল অপরদিকে শ্রমিককেও পোষণ করতে হবে আপোসমূলক মনোভাব। উভয়ের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া মিল-কারখানার যৌথ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে না। মালিকের মনে রাখতে হবে, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শ্রমিক যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার লভ্যাংশে যদি তার কোন অধিকার না থাকে তাহলে মনের দিক থেকে সে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করবে না। আবার শ্রমিককে মনে রাখতে হবে, মিল-কারখানায় উৎপাদন না হলে অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের মান বাজারে নিকৃষ্ট হলে আর্থিক লাভ হবে কিভাবে এবং লভ্যাংশের বর্ধিত অংশই বা সে পাবে কি করে ?

মালিককে প্রতিনিয়ত লক্ষ রাখতে হবে শ্রমিক সন্তুষ্ট মনে কাজ করছে কি না। মালিক ও শ্রমিক উভয়ের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করতে হবে। মিল-কারখানায় মূলধন নিয়োগই যথেষ্ট নয়। স্বল্প মূলধনও অধিক লাভের সুযোগ করে দিতে পারে যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট মনে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা পায়। মালিক যদি সহানুভূতিশীল আচরণ দ্বারা শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে পারেন তবেই উৎপাদন বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যতটা সম্ভব মালিক স্বীয় আরাম-আয়াস শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। মালিককে প্রমাণ করতে হবে তিনি অধিক উৎপাদনের চাইতে শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অধিক উদ্গ্রীব। প্রয়োজনের চাইতে বেশি ভোগ-বিলাসে গা এলিয়ে দিতে পারবেন না তিনি। বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করা উচিত হবে না তার জন্যে। শ্রমিকের প্রতি শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখালে চলবে না; ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়াসকে তাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। অনেকে হয়তো এটাকে অবান্তর মনে করবেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল কথা। মালিকের দায়িত্ব, তার বুদ্ধিমত্তা, সুষ্ঠুভাবে কারখানা পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক উন্নতি বিধানে তার নিরলস সাধনা প্রচেষ্টা, শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তার সহানুভূতিশীল প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা ইত্যাদি সবকিছু শ্রমিকদের সামনেই দিনের পর দিন প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব এই বিরাট দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মালিককে শ্রমিকদের চাইতে কিছুটা বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতে হবে—শ্রমিকরাই এটা

www.pathagar.com

অনুভব করবে। তখন শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় অতি আনন্দের সাথে তাকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দেবে। শ্রমিকরা তখন মালিকের এই অধিক সুযোগ-সুবিধার জন্যে ঈর্ষান্বিতও হবে না।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে পরিচালক উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী তিনিই আদর্শ মালিক বা পরিচালক—শ্রমিকদের প্রিয় বন্ধু। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে এ ধরনের মানুষই। প্রকৃতপক্ষে এই গুণসম্পন্ন মালিক ও পরিচালকের ওপরই নির্ভর করা যায় দেশ গঠনের কাজে।

www.pathagar.com

সামাজিক জীবন

আদর্শ নাগরিক

ব্যক্তি সমষ্টি নিয়েই জাতি গঠিত হয়। অতএব ব্যক্তি চরিত্র যেরূপ হবে জাতীয় চরিত্র সেরূপ হতে বাধ্য। ব্যক্তি আদর্শ মানুষ হলে জাতিও আদর্শ জাতি বলে পরিচিত হবে। এজন্যে ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

সভ্য সমাজে দেশের সাধারণ নাগরিকের কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। যেমন জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার, মান-সম্মান ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের অধিকার ইত্যাদি। খাওয়া-পরা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধাও থাকতে হবে একটি সভ্য সমাজের সাধারণ নাগরিকের। তাকে দিতে হবে বাক-স্বাধীনতা, দিতে হবে স্বমতালম্বী লোকদের নিয়ে সংঘ-সমিতি গঠন করার অধিকার। বিচার-আদালতের দ্বার খোলা থাকতে হবে তার জন্যে। রুজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত থাকতে হবে সাধারণ নাগরিকের জন্যে। এই অধিকারসমূহ এবং আনুষঙ্গিক অন্য সুযোগ-সুবিধাগুলো থাকবে একটি সভ্য সমাজের সাধারণ বাসিন্দার জন্যে। অধিকারের এই তালিকার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকাটিও জুড়ে দিতে হবে সমাজ জীবনের সমতা রক্ষাকল্পে। অধিকারের সাথে দায়িত্ব হচ্ছে সুষম সমাজ জীবনের পূর্বশর্ত। সভ্য সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে অধিকার আদায়ের সাথে দায়িত্ব পালনও অত্যাবশ্যকীয়। কারোর কাছে আমার কোন প্রাপ্য থাকলে আমার কাছেও সেরূপ অন্য কারোর কোন প্রাপ্য থাকতে পারে, প্রত্যেক নাগরিককেই এই মনোবৃত্তি নিয়ে সমাজে বাস করতে হয়—সুসংহত সমাজের এটাই নিয়ম। একজন নাগরিক তার সকল অধিকার কড়ায় কড়ায় উসুল করে নেবে ; কিন্তু তার কাছে পাওনা অধিকার দিতে চাইবে না, এই মানসিকতা সমাজবদ্ধ জীবনে অচল—এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

অধিকার মেপে মেপে পুরোপুরি আদায় করে নিলে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য মেপে মেপে পুরোপুরি পালন করলে একজন নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে এবং সমাজের চোখে অবশ্যই প্রশংসার পাত্র ; কিন্তু দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে যারা এরূপ চুলচেরা হিসেব করে চলে তাদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজ গড়া যায় না। আদর্শ মানুষ দিয়ে যে সমাজ গড়ার পরিকল্পনা এই মানুষ দ্বারা সে সমাজ

www.pathagar.com

গঠিত হতে পারে না। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানুষ তার নাগরিক অধিকার আদায়ের সময় কম আদায় করবে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সময় একটু বেশি পালন করবে। অপরের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য কম করে নেবে এবং অপরের প্রাপ্য দেয়ার সময় একটু বেশি দেবে—তবেই তো সে আদর্শ মানুষে পরিগণিত হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের স্বভাবে এই উদারতা পরিলক্ষিত হলে সে সমাজ হবে আদর্শ সমাজ, সে সমাজে বাস করাটা সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হবে—সেই সমাজ হবে অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

আইন-শৃঙ্খলা নিজে মেনে চলা এবং অপরকে মেনে চলতে উৎসাহিত করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা না থাকলে অন্তত অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে তাকে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন প্রকার সমর্থন যোগাতে পারবে না অন্যায়ের প্রতি। একজন নাগরিক নিজে সৎ ও সাধু হলেই চলবে না অপরকেও সৎ ও সাধু হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে তাকে। সমাজের অধিকাংশ লোক অসৎ জীবনযাপনে মত্ত থাকলে একা একজন সৎ ও সাধু হতে পারে না। কাজেই তাকে দৃঢ়তার সাথে সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার বিলুপ্ত করার কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে, সৎ নাগরিকদের সমন্বয়ে সংগঠন করতে হবে এবং যৌথভাবে সমাজ-দেহ থেকে অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করতে হবে—তবেই তো আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে।

আদর্শ আইনজীবী

আইনজীবী সম্প্রদায় সমাজের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ্য। আইনজীবীদের ব্যবসা স্বাধীন। অতএব মন তাদের প্রশস্ত, দৃষ্টিভঙ্গি উদার। আইনের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। সমাজের প্রতি তাদের অবদান বিরাট। একটি জাতিকে আইনানুগ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে আইনজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এককথায় সভ্য জাতি হিসেবে কোন জাতিকে গড়ে তুলতে আইনজীবীদের স্থান প্রথম সারিতে। আইন ব্যবসায়ীরা একদিকে অধিকার বঞ্চিত মজলুম জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাদের অধিকার আদায় করে দেন। অপরদিকে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ আইনের অপপ্রয়োগ করলে তাদের সতর্ক করে দেন। এভাবে সমাজে আইনের শাসন চালু করার ও চালু রাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আইনজীবীদের ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া আইনজীবীদের ব্যবসা স্বাধীন বলে তারা সমাজসেবা ও সমাজ-সংস্কারের মতো কল্যাণমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমাজে বিভিন্ন স্তরের লোক আইনজীবীদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের শরণাপন্ন হয়, এই সুযোগে দেশের একটা বিরাট অংশের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়নের কাজে

www.pathagar.com

সাহায্য করতে পারেন এই সুধী সমাজ। মোটকথা, আইনজীবী সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুমুখী। দেশ গঠনের এবং দেশের মানুষকে চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ-সুবিধা বহুলাংশে এই আইনজীবী সমাজের এখ্‌তিয়ারে।

দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির উপর আইনজীবীদের অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি। এই জনমানবকে চরিত্রবান ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন কর্মঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আইনজীবীরা অনায়াসেই এগিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু এই মহৎ কাজের জন্যে তাদেরকে মনের দিক দিয়ে প্রথমে প্রস্তুতি নিতে হয়। আমরা জানি এ যুগের আইনজীবী সমাজ আইনের প্যাঁচে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। অধিকাংশ স্থলে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করাটাকেই তাদের একমাত্র সাফল্য মনে করা হয়। সত্য-মিথ্যার তারতম্য করার অবসর নেই এ ব্যাপারে। একটি খুনি-আসামি দিন দুপুরে একটি নিরীহ লোককে খুন করলো। এই খুনি ব্যক্তি অথবা তার প্রতিনিধি আইনজীবীর কাছে এসে তার অপরাধ স্বীকার করলো বটে ; কিন্তু এই মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধের জন্য অনুতপ্ত না হয়েই আইনজীবীর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলো তাকে বাঁচাবার। সে আইনজীবীকে যে কোন অংকের মুদ্রা দিতে প্রস্তুত—শত হলেও একটা প্রাণের মূল্য তো ? এবার আইনজীবী এগিয়ে এলেন তার আইনের ধারাসমূহ প্রয়োগ করার কাজে। কাজ অতি বিচক্ষণতার সাথে করতে হচ্ছে। লোকটার সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে আইনজীবী তাকে প্রথমেই শেখালেন, সে পরিষ্কার বলে দেবে সে এই খুন করে নি—ব্যক্তিগত শত্রুতাবশত তাকে এর সাথে জড়ানো হয়েছে ইত্যাদি। এবার এই অস্বীকৃতিকে প্রমাণ করার জন্যে আইনজীবীকে মিথ্যার জাল বুনতে হচ্ছে, বিরাট সাধনা এতে। সারা রাত জেগে থেকে বিচারকের সামনে খুনি ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণিত করার সব রকম কলা-কৌশল তৈরি করার পালা শুরু হলো এবার।

অপরদিকে নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে অপর এক আইনজীবীর শরণাপন্ন হলো তার উত্তরাধিকারী এক ব্যক্তি। সে পরিষ্কার করে বলতে পারলো না প্রকৃত হত্যাকারী কে, তবে সন্দেহবশত কাউকে জড়ালো। আইনজীবী এটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাড়া করলেন তার কেস। তাকে অবশ্যই জিততে হবে তার যুক্তিতর্কে। অভিযুক্তকে শাস্তি দিতেই হবে। এতে আইনজীবীর সুনাম ও সুখ্যাতি। এই সুনাম ও খ্যাতি অর্জিত না হলে ভবিষ্যতে আরো দশটা মকদ্দমা তার কাছে আসবে কেন ? উভয় পক্ষের আইনজীবীদ্বয় এখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। প্রত্যেকেই বাণ ছুড়ছেন তার প্রতিপক্ষের দিকে। বাদি-বিবাদি উভয় পক্ষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনুসরণ করছে আইনজীবীদ্বয়কে—উদগ্রীব হয়ে আছে চরম রায়ের প্রতীক্ষায়।

www.pathagar.com

আইন-ব্যবসার দু'টো দিক। এর একটা দিক সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে এইমাত্র আলোচনা করা হলো। এই ব্যবসার অপর দিক হলো—সমাজের কারোর প্রতি অবিচার করা হলে এবং আদালতের কাছে সে বিচার প্রার্থী হলে আইনজীবী অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। সাহায্য না করলে বরং অবিচার করা হবে তার প্রতি। সুবিচার ও ন্যায়-বিচার পেতে সাহায্য করাই আইন ব্যবসায়ীদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আইনজীবীকে এ দু'টো দিকই রক্ষা করে চলতে হবে, না তিনি শুধু একটা দিক অর্থাৎ সত্যিকারের অধিকার বঞ্চিত বিচারপ্রার্থীর সাহায্য করবেন ? এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিচার প্রার্থীর সাহায্য তো তিনি করবেনই আর প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রকৃত অপরাধীকেও আইনজীবী আশ্রয় দেবেন। এই আশ্রয় সুবিচার পাবার জন্যেই তিনি দেবেন। অপরাধীকে যাতে অপরাধের মাত্রার অধিক শাস্তি না দেয়া হয় সেজন্যে তিনি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন—এটার নামই সুবিচার। তিনি এ কাজের জন্যে অবশ্যই পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন।

অনেকের কাছে ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হতে পারে। আসলে এতে জটিলতা নেই এতটুকু। পূর্বোল্লিখিত খুনের কথাটাই আলোচনা করে দেখা যাক। এখানে দু'টো বিষয়ের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। একটা হচ্ছে আইনজীবীর নিজের সম্পর্কে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সমাজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। সমাজের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা প্রথমে আলোচনা করা যাক। একটি লোক কোন একজন নিরপরাধকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো। আইনের ফাঁক দিয়ে তাকে যদি নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সে শাস্তি না পায়, তাহলে সে ধরনের হত্যাকাণ্ড আরো উৎসাহ পাবে না কেন ? শুধু সে একাই নয় সমাজ বিরোধী অন্য দুষ্কৃতকারী লোকরাও এতে জঘন্যতম অপরাধ করতে উৎসাহিত হবে না কেন ? একটু ধীর-ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে একটি নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার সামিল। কারণ, যে পাপিষ্ঠ একটি নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে পারে সে সুযোগ পেলে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করতেও পারে। অতএব প্রকৃত হত্যাকারীকে তার মানবতা বিধ্বংসী জঘন্য অপরাধের জন্যে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেতে হবে। এভাবেই মানব সমাজে জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

এবার আইনজীবীর নিজের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আইনজীবী সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে শুধু একটা মিথ্যার আশ্রয়ই নেবেন না বরং তাকে মিথ্যার জাল বুনতে হবে একথা আগেই বলা হয়েছে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যে সমাজের এই বুদ্ধিজীবী যে মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন এবং মাথা খাটাবেন তার চরিত্রে এর কোনই প্রতিক্রিয়া হবে না, এটা কি সম্ভব ? তার মনে অবশ্যই এই কর্মতৎপরতার

www.pathagar.com

ছাপ পড়বে—দাগ কাটবে। এমনিভাবে একবার নয় দু'বার নয় বারবার এ ধরনের বিচারপ্রার্থী তার শরণাপন্ন হবে এবং বারবার তাকে এই একই পন্থা অনুসরণ করতে হবে তার সুনামের জন্যে এবং রুজি-রোজগারের জন্যে।

যিনি এই প্রক্রিয়ায় দিনের পর দিন নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন, সমাজ সংস্কার ও জনগণের চরিত্র গঠনের কাজে এগিয়ে এলে সমাজের মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি কতটুকু সক্ষম হবেন সেটাই বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে যিনি সমাজের লোকদের চরিত্র গঠনের কাজে হাত দেবেন সর্বপ্রথম তার নিজের চরিত্র হতে হবে নির্মল নিষ্কলঙ্ক। তবেই এই মহৎ ও মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে।

আদর্শ সমাজ-সংস্কারক

সমাজ-সংস্কার বলতে আমরা বুঝি সমাজের কুপ্রথা তা যে ধরনেরই হোক না কেন, দূর করে সমাজের উন্নতি বিধান। যিনি এই জটিল কাজটি করেন তিনি সমাজ-সংস্কারক। এ আলোচনায় সমাজ-সংস্কারককে সমাজ-নেতা অথবা শুধু নেতা বলে আখ্যায়িত করা হবে।

সমাজ-সংস্কারের কাজ সময়সাপেক্ষ। একদিন বা দু'দিন, এক বছর বা দু'বছরেই এই সংস্কারের পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে যে সমাজ বিপ্লব ঘটেছে বহু বছর নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে। অতএব সমাজ-নেতাকে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সাথে সংস্কারের কাজ করে যেতে হবে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এগুতে হবে তাঁকে। চলার পথে থেমে গেলে চলবে না। তাঁর মনোবল হতে হবে মজবুত ও সুদৃঢ়।

প্রারম্ভে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। সংস্কার ও বিপ্লব এই দু'টো শব্দ অধিকাংশ স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু উভয়ের প্রেরণা ও কর্মপদ্ধতিতে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয় সমাজ-সেবার অনুপ্রেরণা থেকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতি মনে দরদ এবং সমাজকে সংস্কারমুক্ত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করে এই কাজ শুরু করা হয়। পক্ষান্তরে বিপ্লবের সূচনা হয় তীব্র প্রতিহিংসা ও ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে। তাই পরিবর্তনের জন্যে ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করা হয়। সমাজের লোকদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক মনোভাব সৃষ্টি করা হয়। এতে একটা অন্যায় দূর করতে গিয়ে আর একটা অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়।

সমাজ-সংস্কারের কাজ কয়েকটি স্তরে সম্পন্ন হয়। এর কোন সংক্ষিপ্ত (short-cut) পথ নেই। প্রত্যেক সমাজ-নেতাকেই এসব স্তর পার হয়ে যেতে হয়। এখন সমাজ-সংস্কারের বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে সেগুলোর স্বাভাবিকতা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

www.pathagar.com

এক. পরীক্ষা-নিরীক্ষা

একজন সমাজ-নেতার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সমাজের বর্তমান অবস্থার একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে নেয়া। অতি বিচক্ষণতার সাথে দেখতে হবে সমাজের কোথায় কি গলদ আছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এতটুকু ত্রুটি থাকলে চলবে না। চিকিৎসক যদি রোগ নির্ণয় করতে ভুল করে তবে তার চিকিৎসা হবে ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে রোগীর দেহে উল্টো প্রতিক্রিয়া হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। এই পর্যালোচনার কাজ অত্যন্ত ক্লান্তিজনক। এজন্যে দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে জনগণের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হতে হয়। এ কাজ সময় সাপেক্ষ। আরাম কেদারায় বসে বসে এ কাজ অসম্ভব। জনসাধারণের জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে একাকার করে দিতে হবে। এতে একদিকে সমাজ-দেহের রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় অপরদিকে জনগণের কাছে তাদের কল্যাণকামী দরদী বন্ধু হিসেবে পরিচিত হওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করা সহজ হয়।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বিশাল জনসমষ্টির জীবন-ধারার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করতে হবে। সমাজের গলদ কোথায়, জনগণের দুঃখ-দৈন্যের কারণ কি, তাদের মানসিকতায় ত্রুটি কোথায়, সমষ্টিগত জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ, বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কতটুকু, কোন সমস্যা অপর কোন একটির সমস্যার জন্ম দিয়েছে কিনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। সর্বোপরি তাকে খুঁজে বের করতে হবে যে, সব সমস্যার মূল কারণ কোনটি। এলোপাতাড়িভাবে অগ্রসর না হয়ে প্রথম ও মূল সমস্যার মূলেই আঘাত করা বুদ্ধিমানের কাজ। এতে সংস্কারের কাজও সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

দুই. কর্মসূচী গ্রহণ

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করে এবার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই কর্মসূচীর ওপরই নির্ভর করবে সাফল্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্মসূচী তৈরি করতে হবে। কর্মসূচী হতে হবে বাস্তবধর্মী। এতে থাকবে না সাময়িক উত্তেজনার ইঙ্গিত। সমাজের প্রতি দরদ ও সমাজ-সেবার অঙ্গীকার থাকবে এতে। এই কর্মসূচী অনুসারেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে। সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই ন্যায়নীতির পরিপন্থী কোন পথ অনুসরণ করা যাবে না। উদ্দেশ্য মহৎ বিধায় সেখানে পৌঁছতে হবে মহৎ পন্থায়। অন্যথায় উদ্দেশ্য ও গন্তব্য দু'টোই বিপর্যস্ত

www.pathagar.com

হবে। বস্তুত মহৎ উদ্দেশ্য ও সৎ নেতৃত্ব হচ্ছে সমাজ গঠনের ও নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপনের পূর্বশর্ত। ধাপে ধাপে এগুতে হবে সংস্কারের কাজে। কর্মসূচী মোতাবেক সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আদর্শ পেশ করতে হবে। যে আদর্শ সামনে রেখে সমাজ-সংস্কার করা হবে সেটা বিশদভাবে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই আদর্শ পেশ করার পরেই পর্যায়ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হবে।

১ম পর্যায় : সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের গোচরে এই নতুন আদর্শবাদের কথা প্রথম এলে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেবে না এতে। কারণ, নিজ নিজ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি মজবুত। সে গণ্ডিতে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই বলেই তাদের বিশ্বাস। এরা কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ; কিন্তু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই নতুন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির হালকা সমালোচনা করবে। কাজটা কিছুটা অগ্রসর হলে এবং সমাজের দু'চারজন এটাকে গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে।

২য় পর্যায় : সভ্যতার আদি যুগ থেকে দেখা গেছে সমাজ যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক না কেন সমাজে কিছু সংখ্যক সৎ লোক বাস করে, যারা নিজ নেতৃত্বে কিছু করতে অপারগ ; কিন্তু অন্যের নেতৃত্বে কাজ করতে সক্ষম। পরবর্তী পর্যায়ে তারাও নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই নীরব সৎ লোকেরা যখন ধীরে ধীরে নতুন মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সহযোগিতা করতে শুরু করবে তখন সমাজের কুসংস্কারবাদী শ্রেণী ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করবে। এই বিদ্রূপাত্মক কাজে তারা প্রচলিত সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ যথা আলাপ-আলোচনা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি কাজে লাগাবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এতে তাদের নিজেদের উপকার হোক বা না হোক পরোক্ষভাবে এই প্রক্রিয়া বহুলাংশে আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক হবে। লোক যখন এই নতুন মতাদর্শের বিরুদ্ধে কথা শুনবে, এর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে মিথ্যা মুখরোচক গল্প তাদের কানে পৌঁছবে তখন স্বাভাবিকভাবে আদর্শের প্রতি হবে তারা আকৃষ্ট। ফলে প্রতিপক্ষের দ্বারাই আদর্শের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। এভাবে এই কর্মসূচী এগুতেই থাকবে এবং এর গতিপথ রোধ করা যাবে না।

৩য় পর্যায় : এ পর্যায়ে কুসংস্কারে ডুবে থাকা লোকগুলো এবং কায়েমী-স্বার্থবাদীরা আর একটু শক্ত হয়ে ময়দানে নামবে। সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ার কর্মসূচী নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের উপর নির্যাতন শুরু হবে। আত্মোৎসর্গীকৃত সমাজ-কর্মী এই নির্যাতনে এতটুকু ঘাবড়াবে না। নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সে আরো শক্তিশালী হবে। এ যেন আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা বের হয়ে আসা। অবশ্যই এই নির্যাতনের তীব্রতায় কিছু কর্মী পিছু হটবে—আর এই হটে যাওয়াটাই তার জন্যে

www.pathagar.com

এবং কর্মসূচীর সাফল্যের জন্যে অতি প্রয়োজন। কারণ চরম পরীক্ষার সময় এ ধরনের সমাজ-কর্মীর দ্বারা সাফল্য লাভ করা যায় না। এই পর্যায়ের কাজ দীর্ঘদিন যাবত চলবে—এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সমাজ-সংস্কারের জন্যে আত্মোৎসর্গীকৃত সৎ-কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন। আর নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে পার হয়ে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই এই যোগ্যতা লাভ করা যায়। এই প্রশিক্ষণে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন এবং কর্মীসংখ্যাও সন্তোষজনক হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী তৈরি হয়ে গেলে এবং তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলো।

৪র্থ পর্যায় : এটাই হবে শেষ ও চরম পর্যায়। এবার জরাজীর্ণ সমাজের গণস্বার্থবিরোধী আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর সমাজপতিদেরকে সরে দাঁড়াতে বলা হবে। তারা স্বেচ্ছায় সরে না গেলে তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে। তাদের স্থলে ত্যাগী আত্মোৎসর্গীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ দরদী নেতা ও কর্মীবৃন্দ পূর্ব-ঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে সংস্কারের কাজ শুরু করবে। জনসাধারণ অবশ্যই পূর্ণ সহযোগিতা দান করবে। কারণ তারা আগেই কল্যাণমূলক কর্মসূচীর সাথে পরিচিত হয়েছে।

আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, সমাজ-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর কাজ চার পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হবে।

১ম কাজ : কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পরিশোধন। তবে এ কাজে চরিত্রহানিকর নয় এমন সব উপায়-উপকরণের সাহায্য নিতে হবে।

২য় কাজ : যেসব লোক সমাজ-নেতার দেয়া মতাদর্শ ও কর্মসূচী বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছে তাদের সমন্বয়ে কর্মীবাহিনী গঠন করা এবং এই কর্মীবৃন্দকে সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচী অনুসারে ট্রেনিং দেয়া।

৩য় কাজ : কর্মীদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো এবং সমাজ সেবার কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া। এ কাজে তারা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং নিঃস্বার্থ সমাজসেবক হিসেবে জনগণের সুখ-দুঃখের সাথে নিজেদেরকে শামিল করবে। স্বভাবতই জনগণ এদের কর্মতৎপরতায় ও চরিত্র-মাধুর্যে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের কাজে সহযোগিতা দানে এগিয়ে আসবে।

৪র্থ কাজ : এবার কর্মীবাহিনী জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ও আস্থা নিয়ে গোটা সমাজ-কাঠামো পাল্টে দিয়ে এক নতুন আদর্শবাদের ভিত্তি স্থাপন করবে।

তিন. কর্মী বাহিনী গঠন

জনকল্যাণই সমাজ-সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য। জনকল্যাণমূলক সমাজ-সংস্কার একটা আদর্শ-ভিত্তিক প্রচেষ্টা। কোন আদর্শই আপনা আপনি সমাজে কায়েম হয় না। এজন্যে আদর্শ কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। জনকল্যাণই যেহেতু উদ্দেশ্য, অতএব

www.pathagar.com

আদর্শ সমাজ গড়ার জন্যে আদর্শ সমাজ-কর্মীরও প্রয়োজন। সমাজ-সংস্কারের নেতা এই আদর্শ কর্মীবাহিনী তৈরি করবেন। বলাবাহুল্য, আদর্শ কর্মী তৈরি করার জন্যে আদর্শ নেতার প্রয়োজন। নেতা কর্মীদেরকে যে ধরনের আচার-আচরণের শিক্ষা দেবেন কর্মীরাও সে ধরনের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হবে। শুধু নেতার মানসিকতাই নয়, দেখা গেছে কর্মীরা নেতার বেশভূষাও অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। এ কারণে নেতাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সমাজ-কর্মীদের চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ করতে হয়। সমাজ-সংস্কারের জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করার সময় কর্মীদের যে চরিত্র ও মানসিকতা জন্ম লাভ করবে সংস্কারোত্তর কালে সে চরিত্র ও মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটবে। আজকের শিক্ষা যদি হয় উচ্ছৃঙ্খল, কাল ক্ষমতার নাগাল পেয়ে তারা সুশৃঙ্খল হতে পারবে না। অভিপ্রেত গন্তব্যের দিকে এগুতে গিয়ে আজ যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, কাল ক্ষমতা হাতে পেয়ে হঠাৎ সত্যনিষ্ঠ বনে যাবে না। সমাজ-সংস্কারের প্রস্তুতিপর্বে কর্মীবৃন্দকে যদি যথেচ্ছাচারের অনুমতি দেয়া হয়, পরবর্তী পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা পেলেই তারা যথেচ্ছাচারী হয়ে অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হবে। এভাবে ভুল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীবাহিনীকে তৈরি করলে পরবর্তীকালে আর তাদেরকে আদর্শ কর্মী হিসেবে পাওয়া যাবে না। বরং পরবর্তীকালে এক পর্যায়ে এই কর্মীরাই নেতার নীতিবাক্যের উপদেশকেও অস্বীকার করে বসবে। কারণ এর আগে নেতা তাদেরকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমাজ সংস্কারের একটা বিশেষ দিকের আলোচনা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে ভাঙা-গড়ার দিক। পুরানো সমাজকে ভেঙ্গেই তো নতুন সমাজ গড়তে হয়। এই উদ্দেশ্যে গড়ার আগে ভাঙতে হয় একথা অনস্বীকার্য ; কিন্তু এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত তিল পরিমাণও ভাঙা উচিত হবে না।

সমাজ-নেতার সংস্কারের কাজ ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, হত্যাকারী ও ডাকাতের অস্ত্র ব্যবহারের সাথে নয়। ডাক্তার রোগীকে বাঁচাবার জন্যে দরদের সাথে শুধুমাত্র ক্ষতস্থানেই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে তার কত আনন্দ ; কিন্তু হত্যাকারী ও ডাকাত নৃশংসতার সাথে অস্ত্রের সাহায্যে জীবন বধ করে। সংস্কারবাদী নেতা ডাক্তারের মতো সমাজের ততটুকু অংশই পাল্টে দেন যতটুকু না পাল্টালেই চলে না। তাছাড়া সমাজ-সংস্কারের কাজটা শুধু বৈষয়িক ভাঙা-গড়ার ব্যাপার নয়। এর সাথে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভাঙা-গড়ার প্রশ্ন জড়িত। অতএব সমাজ-কর্মীর মধ্যে থাকতে হবে সমাজ-সেবার মনোবৃত্তি। ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের মনে। তবেই তারা আদর্শ সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত হবে জনসমক্ষে এবং তাদের দেয়া আদর্শ অনুসারে সমাজের মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেদের গড়ে তুলতে উৎসাহ পাবে। সমাজ-সংস্কারের এই কাজে কর্মী সংখ্যা বিরাট হবার

www.pathagar.com

তেমন প্রয়োজন নেই। চরিত্রবান ক্ষুদ্র দলও বিশাল জনসমষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম।

সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও সামগ্রিক উন্নতির জন্যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে সংস্কারবাদী জননেতাকে। তাঁকে সংস্কার করতে হবে রাজনীতির, নতুন কাঠামোতে গড়তে হবে অর্থনীতি। সর্বোপরি তাঁকে পাল্টে দিতে হবে সমাজের গোটা দৃষ্টিভঙ্গি। তাই তাঁকে হতে হবে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, মনস্তাত্ত্বিক এবং স্থাপন করতে হবে নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমাজ-সংস্কারের পরিবর্তনকালীন সময়ে (Transitional period) সমাজ-নেতাকে কর্মীবাহিনীর সমন্বয়ে তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের একটা রূপরেখা পেশ করতে হবে সমাজের সামনে। এই প্রশিক্ষণে গড়া কর্মীবৃন্দ ভবিষ্যতে বৃহত্তর সমাজ কাঠামোতে নেতৃত্ব দান করবে।

আদর্শ ধর্মীয় নেতা

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক জুড়ে দেয়াই হচ্ছে ধর্মীয় নেতার প্রধান কর্তব্য। এই সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়লেই সমাজ জীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তখন মানুষ নানা প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং দিশেহারা হয়ে পৃথিবীতে তার প্রাপ্য মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এমন কি তখন সে পশু-জীবনের চাইতেও নিম্নস্তরে নেমে আসে। ধর্মীয় নেতার নিরলস প্রচেষ্টায় মানুষের মর্যাদাবোধ পুনর্জীবিত হয়। অতএব ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণ কামনাই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য। সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি ধর্মের আহ্বান। মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতি ছাড়া সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ গঠিত হয় না। সে কারণে ধর্মীয় নেতা গোটা মানব সমাজকে ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। এ আহ্বানে যারা সাড়া দেয় তার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে এবং পার্থিব জীবন কলুষমুক্ত হলে পারলৌকিক জীবনও সুখময় হবে বলে সহজেই অনুমান করা যায়।

ধর্মীয় নেতার আহ্বান বিশ্ব মানবতার প্রতি। অতএব তিনি বিশ্ব প্রেমিক। মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে পার্থক্য করে এবং মাঝখানে বিদ্বেষ ও ঘৃণার একটা প্রাচীর খাড়া করে শুরু হয় না ধর্মীয় নেতার কাজ। স্রষ্টা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই এই পার্থিব জীবনে সমান চোখে দেখেন। খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার সকল সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্যে সমান। পরিশ্রম করে প্রত্যেকেই তার পরিশ্রম-লব্ধ সুফল ভোগ করতে সক্ষম এখানে। অবশ্য স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করলে এখানকার ব্যক্তিজীবনও হয় সুখময় এবং সমাজজীবনও হয় গ্লানিমুক্ত। পৃথিবীর মানুষগুলো স্রষ্টার পোষ্য তাই তো তাদের ভরণ-পোষণের সর্বময় ব্যবস্থা করেছেন তিনি। স্রষ্টার নির্দেশিত পথের পরিপন্থী

www.pathagar.com

অন্য কোন পথ অনুসরণ করলেও তিনি তাকে বঞ্চিত করেন না পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকে—তিনি মহানুভব। বস্তুত এই পৃথিবীর জীবন হচ্ছে পরীক্ষার স্থান। স্রষ্টা এখানে মানুষকে তার মত ও পথ অনুসরণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে ইচ্ছা করলে কল্যাণের সুপথ গ্রহণ করে জীবনযাপন করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে অকল্যাণকর মানবতাবিরোধী ও সমাজবিরোধী পথও বেছে নিতে পারে। প্রথমোক্ত পথে রয়েছে তার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পারলৌকিক মুক্তি আর শেষোক্ত পথে রয়েছে তার জন্যে পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য এবং পরজীবনের চির শাস্তি।

ধর্মীয় নেতা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের প্রতি সমানভাবে দরদ দেখিয়ে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবেন। এই আহ্বানে যারা সাড়া দেবে এবং তার দেয়া কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে রাজি হবে তারা তো এই ধর্মীয় নেতাকে শ্রদ্ধা করবেই, অধিকন্তু যারা তার এই আহ্বানের প্রতি সহযোগিতা করতে রাজি হবে না তারাও এই নেতার সদ্ব্যবহার, সদাচার, গোটা সমাজের জন্যে তার দরদ প্রভৃতি গুণাবলীর কারণে ধর্মীয় নেতাকে শ্রদ্ধা করবে ও ভালোবাসবে। তখন সমাজের সকল শ্রেণীর লোক এই নেতাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল বন্ধু বলে গ্রহণ করবে, তাকে ভূষিত করবে আদর্শ মানুষ-এর উপাধিতে।

এ কথা সত্য যে, বিভিন্ন যুগে ধর্মীয় নেতার সাথে কুসংস্কারক্লিষ্ট কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সংঘর্ষ স্বাভাবিক। সত্য-মিথ্যার লড়াই চিরন্তন। মানবতার মুক্তির বাণী নিয়ে আসা যে কোন আন্দোলন স্বার্থপর শোষকদের ওপর আঘাত হানবেই। কিন্তু মানবতার এই শত্রুরা পরিশেষে নির্মূল হতে বাধ্য।

আদর্শ বিচারক

অধিকার-বঞ্চিত মানুষের আশ্রয়স্থল বিচারালয়। মজলুম জনমানবের সর্বশেষ আশার স্থল বিচারালয়। এ কারণেই সভ্য সমাজে বিচারকের স্থান সর্বোচ্চে। বিচারপ্রার্থী যতই দুর্বল হোক না কেন, বিচারকের সামনে সে অত্যন্ত শক্তিশালী। অভিযুক্ত ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন বিচারকের সামনে সে অত্যন্ত দুর্বল। ন্যায় বিচারের এটাই মূল কথা। বিচারক ন্যায়ের তুলাদণ্ডে যে বিচার-ফয়সালা করেন সেখানে ইনসাফ হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড। পক্ষপাতিত্বের লেশমাত্র স্থান নেই সেখানে। হোক না অভিযুক্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রের কর্ণধার, হোক না সে রক্তের সম্পর্ক রাখা নিকট আত্মীয়—পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবুও বিচারকের সামনে সবাই সমান। একজন সাধারণ নাগরিক কোন অপরাধ করলে যে শাস্তি পাবে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সে একই অপরাধে অভিযুক্ত হলে একই শাস্তি পাবে—ইন্‌সাফ ও ন্যায় বিচারের এটাই চরম ও পরম নির্দেশ।

www.pathagar.com

বিচারের উপরোল্লেখিত নিরপেক্ষ নীতি সমাজ দেহে বিরাট প্রভাব ফেলে। এতে সমাজের প্রত্যেকটি লোক শুধু নিরাপত্তা বোধ করবে এমন নয় বরং নৈতিক চরিত্রের মানও উন্নত হবে। এতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি যথাযথ পালিত হবে। তাতে সচ্চরিত্রবান লোকেরা উৎসাহ পাবে ভালো কাজ করায় এবং অসচ্চরিত্র লোকেরা অসদাচরণে ভয় পাবে। এমনিভাবে সমাজে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যে বিচারক এমনি পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন তিনি অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ বিচারক হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করবেন সকলের কাছে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় জীবন

আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনার পর এবার সর্বশেষ অথচ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হচ্ছে রাষ্ট্রনায়ক সম্পর্কে।

যাঁর ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্র শাসিত হয় সাধারণত তাকেই আমরা রাষ্ট্রনায়ক বলি। একটা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। বংশানুক্রমে রাষ্ট্রের কর্ণধার হোন (আধুনিক দুনিয়ায় যার অনুমোদন অতি ক্ষীণ) অথবা জনসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিষ্ঠিত হোন, উভয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতার একটাই উদ্দেশ্য—জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন তথা জনসেবা। যিনি যত বেশি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন তিনি তত বেশি সফল রাষ্ট্রনায়ক।

রাষ্ট্রনায়ক যেহেতু জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অতএব তিনি শ্রেষ্ঠ গুণেরও অধিকারী। যে রাষ্ট্রপরিচালক সমাজ-সংস্কারের কঠিন পথ অতিক্রম করে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, ক্ষমতা লাভের পর তাঁর কাজ অনেকটা সহজ প্রতীয়মান হবে। কারণ তিনি দেশের সকল সমস্যার সাথে পরিচিত। তিনি জনসাধারণকে ভালো করে জানেন। জনসাধারণও তাঁকে ভালো করে জানে। যে কর্মসূচী নিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন জনসাধারণ সে কর্মসূচীর সাথে পরিচিত। জনসাধারণ তাঁর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বলেই তিনি আজ সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন এবং তার তৈরি কর্মীবাহিনী এবার তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে সমাজ গঠনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রস্তুত।

সমাজ-সংস্কারের আলোচনায় এর আগে সমাজ-নেতার ও সমাজ-কর্মীর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি আভাস দেয়া হয়েছে। সমাজ-নেতার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সুযোগে এবার তাঁকে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার অতএব এখন তাঁর যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন এবং যে দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য সেগুলো হচ্ছে :

১। তিনি প্রত্যেকটি নাগরিকের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য দায়ী।

২। তিনি প্রত্যেকটি নাগরিকের খাওয়া-পরা, শিক্ষা-বাসস্থান ও চিকিৎসার জন্যে দায়ী।

www.pathagar.com

৩। সীমান্ত রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ওপর।

৪। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁকেই বহন করতে হবে।

৫। নাগরিক সাধারণের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়ন করার দায়িত্ব তাঁর।

৬। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বময় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তাঁকে।

৭। দুর্নীতি উচ্ছেদ তাঁর দায়িত্ব।

৮। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁকে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

৯। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মর্যাদা বাড়াবার কার্যকর পন্থা গ্রহণ করতে হবে তাঁকে।

১০। তাঁকে সব ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে হবে। সকল দেশের সকল রাষ্ট্র পরিচালকই দেশকে আদর্শ দেশ হিসেবে গড়বার স্বপ্নসাধ পোষণ করেন, এতে তিল পরিমাণ সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই পর্যায়ে রাষ্ট্রনায়ককেই আদর্শ রাষ্ট্রনেতা হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে একটা জরুরি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। আমরা দৈনন্দিন যে জীবনযাপন করি, অনেকের ধারণা, এর দু'টো ভাগ। একটা ভাগ হচ্ছে নিজস্ব বা বেসরকারি (Private Life) আর একটা ভাগ হচ্ছে জনজীবন বা সরকারি (Public Life)। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মানুষের বিশেষ করে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির জীবনযাপনকে এমনিভাবে দু'টি পৃথক প্রকোষ্ঠে ভাগ করে দেয়া সম্ভব কি না। অতীতকালের কথা বাদ দিলেও বিগত এক দশকের মধ্যে আমাদের সামনে দেশে ও বিদেশে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার জের এখনো চলছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, মানুষের জীবনকে এভাবে ভাগ করা যায় না। আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমুন্নত এবং সভ্য জাতি হবার দাবিদার দায়িত্বশীল তথাকথিত ব্যক্তিদের প্রাইভেট লাইফের কেলেঙ্কারীর জন্যে তাদের পাবলিক লাইফের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অপসারীত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনকে এরূপ পৃথকীকরণ অসম্ভব। একই মানুষ তার মন, মস্তিষ্ক, অনুভূতি—সবই এক। একই উৎস ও সূত্র থেকে সে পায় কর্মপ্রেরণা। তাই তার জীবনকে কিভাবে ভাগ করা যায় ? আমরা যেটাকে প্রাইভেট লাইফ বলি সেটা পাবলিক লাইফকে প্রভাবিত করবেই। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া। মানব জীবনকে দু'টো স্রোতে প্রবাহিত করা যায় না। মানুষ নৈতিকতাবোধ-সম্পন্ন জীব। তার জীবন স্রোতকে দু'দিকে প্রবাহিত করলে, তার নৈতিকতাবোধ আক্রান্ত হবেই এবং তখন সে লাগামহীন নির্লজ্জ জীবনযাপন করতে এতটুকু ভয় পাবে না—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এটাই লক্ষ করছি।

এবার রাষ্ট্রনায়কের অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলো গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

সততা

কথায় ও কাজে রাষ্ট্রপরিচালককে সততা বজায় রাখতে হবে। তাঁর কথা হবে ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁর মুখ থেকে বাজে কথা বের হতে পারবে না। তাঁকে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রপরিচালক হিসেবে তার মুখ থেকে যেসব শব্দ বেরুচ্ছে তার প্রত্যেকটি শব্দ দেশে ও বিদেশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি শব্দের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাঁর মুখের প্রতিটি বাক্য তাঁরই গড়া কর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। কর্মীরা তাঁর কথা ও ভাব-ভঙ্গি অনুসরণ করতে চাইবে—এ প্রবণতা স্বাভাবিক। অতএব রাষ্ট্রনায়কের প্রতিটি কথার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—একথা তাকে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা এবং জনসমাবেশ সব সময়ই মনে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রনায়ক জাতির নিঃস্বার্থ সেবক। এই সেবকের মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁকে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার জনগণের স্বার্থে ব্যয় করার অধিকার রয়েছে তার ; কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে এক কপর্দকও ব্যয় করতে পারবেন না। জনগণ রাষ্ট্রনায়কের সার্বক্ষণিক জনসেবার জন্যে যে সম্মানজনক পারিশ্রমিক নির্ধারিত করেছে এর বেশি তিনি নিতে পারবেন না। এমনিভাবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও রাষ্ট্রীয় অর্থাগার থেকে বেআইনীভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবেন না রাষ্ট্রনায়ক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিরপেক্ষভাবে তাঁকে প্রয়োগ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। এভাবে তিনি হবেন সততার এক মূর্ত প্রতীক—এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলবে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক এবং শাসন পরিচালনায় ন্যস্ত দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ।

তিনি যে কথা বলবেন এবং জনসাধারণকে যে আদেশ-উপদেশ দেবেন, প্রথমে নিজে সেটা পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তখন জনসাধারণ নিষ্ঠার সাথে সাগ্রহে সে আদেশ-উপদেশ পালন করবে। এই পর্যায়ে জনসাধারণের ওপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না, যে বোঝা বহন করা তাদের সাধ্যাতীত। এতে কর্তব্যে ফাঁকি এবং পরিণামে অবাধ্যতার বীজাণু সংক্রামিত হবার আশঙ্কা রয়েছে।

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

একটা জাতির উন্নতি রাষ্ট্রপরিচালকের নেতৃত্বের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে তাঁর অনুসরণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন (আইন পরিষদের সাথেও পরামর্শের কথা বলা হচ্ছে), জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতি, জাতির

www.pathagar.com

নৈতিক চরিত্রবল, জনগণের সার্বিক উন্নতির নিশ্চয়তাদানকারী আদর্শবাদ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিগত চরিত্রবল এগুলো হচ্ছে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে অত্যন্ত জরুরি।

বৈদেশিক সম্পর্ক

এর আগে বলা হয়েছে বর্তমান যুগে কোন দেশই একলা চলার নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে না। অতএব প্রত্যেক দেশকে অপর দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হয়। এই সম্পর্ক কোন অবস্থায়ই আদর্শ বিসর্জন দিয়ে স্থাপন করা যাবে না। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী কোন বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু কোন দেশের প্রতি অযথা বৈরীভাব পোষণ করাও উচিত হবে না। কোন দেশের সাথে চুক্তি করার সময় উপরোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ রেখেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। প্রতিপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ না করলে এক তরফা চুক্তির কোন শর্তই ভঙ্গ করা যাবে না—কারণ দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতেই যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেটা এখন একতরফা ভঙ্গ করা নীতি-বহির্ভূত ও গর্হিত কাজ। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক সাফল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্ভর করে রাষ্ট্রপরিচালকের বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির ওপর।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা-দানকারী রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে সভ্য সমাজের মাপকাঠি। এই ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দান করতে পারেন রাষ্ট্রপরিচালক নিজে। তিনি নিজে ও তাঁর অধীনস্ত পদস্থ কর্মকর্তারা এবং একজন সাধারণ নাগরিক ন্যায়বিচারের সামনে সমমর্যাদার অধিকারী। একজন সাধারণ নাগরিক অভিযুক্ত হলে বিচারকের কাছে যে মর্যাদা লাভের যোগ্য, রাষ্ট্রনায়ক নিজে অভিযুক্ত হলে তিনিও সাধারণ নাগরিকের চাইতে অধিক মর্যাদার দাবি করতে পারেন না।

বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির স্থান নেই এতটুকু, রাষ্ট্রনায়ককে একথা মেনে চলতে হবে। তিনি অথবা তাঁর নিকট আত্মীয়ও কোন অপরাধ করলে বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। কোন প্রকার স্নেহ-প্রীতির অবকাশ নেই ন্যায়বিচারে। বিচার ব্যবস্থায় কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন রাষ্ট্র পরিচালকের নৈতিক দুর্বলতারই পরিচায়ক।

গণসংযোগ

রাষ্ট্র পরিচালকের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। ঐসব দায়িত্ব পালনের একমাত্র উদ্দেশ্য জনকল্যাণ ও জনসেবা। সমাজের লোকদের

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রনায়কের প্রতিনিধিদের দ্বারা বহু ক্ষেত্রে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। আবার এমনও হতে পারে যে, তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক দেয়া সমাধান জনগণের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক নয়, তখন তারা জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়কের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করতে চায়। তাই জনসাধারণ যাতে অতি সহজে তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত। মূলত জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে বহু জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে অতি সহজে ও অল্প পরিশ্রমে যা অপর ব্যক্তির পক্ষে স্বভাবতই কষ্টসাধ্য।

সমালোচনা

মানুষের কর্মবহুল জীবন ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ। ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ আমাদের জীবন। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নানাপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় আমাদের। জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ভুল বুঝতে পারলে সংশোধন করে নেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা না জানার দরুন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ভুল নিরসন হওয়া প্রয়োজন। সমালোচনার দ্বারা ভুল ধরা পড়ে এবং তা সংশোধন করে নেয়ার পথ সহজ হয়। আর ভুল ধারণা হয়ে থাকলে সে ধারণাও দূরীভূত হয় সমালোচনার দ্বারা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। এক প্রতাপশালী রাষ্ট্রপ্রধান একবার জনসমাবেশে ভাষণ দিতে উঠেছেন। হঠাৎ জনতার মাঝখান থেকে জনৈক ব্যক্তি রাষ্ট্র-প্রধানকে লক্ষ্য করে বললো : "হে রাষ্ট্রপ্রধান! আপনি বক্তৃতা শুরু করার আগে জবাব দিন আপনার গায়ের জামা এতো লম্বা হলো কি করে অথচ রেশনে আমরা সমান মাপের কাপড় পেয়েছি।" রাষ্ট্রপ্রধান সামান্যতম বিরক্ত না হয়ে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত তাঁর ছেলেকে এই অভিযোগের উত্তর দিতে বললেন। তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে বললেন : "হ্যাঁ, আমার পিতার জামা একটু লম্বা ঠিকই। ব্যাপার হয়েছে, আব্বাজান উচ্চতায় আমাদের চাইতে বেশি বলে আমার নিজের কাপড়ের অংশটুকুও তাঁকে দিয়েছি, তাতে করে জামা একটু লম্বা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।" এমনিভাবে ভুল ধারণার নিরসন হলো।

কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্মতৎপরতার জন্যে তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে, মনে এ ধারণা পোষণ করলে স্বভাবতই তাঁর ভুল-ভ্রান্তির মাত্রা কম হবে। জনসাধারণের সামনে রাষ্ট্রনায়কের প্রতিটি কাজ আয়নার মতো পরিষ্কার। সে কারণেই জনসাধারণকে তাঁর সমালোচনার পূর্ণ সুযোগ দেয়া উচিত। জনসাধারণকে অবশ্য নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে। তাদের এ অধিকারের অপব্যবহার করা যাবে না। বহু ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির দরুন অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সে কারণেই সমালোচনার অধিকার

www.pathagar.com

থাকলে ভুল ধারণার নিরসন করা সহজ হয়। রাষ্ট্রপরিচালক শাসন ক্ষমতার সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণকে তাঁর কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার দিলে শাসন পরিচালনায় তাঁর প্রতিনিধিবর্গ অতি সতর্কতার সাথে তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন। রাষ্ট্রপরিচালক যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে সততার সাথে কল্যাণ রাষ্ট্রের সেবা করছেন, তাই তাঁর পক্ষে সমালোচনাকে ভয় করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

আদর্শ সৈনিক ও সেনাপতি

দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশই তার সৈন্যবাহিনীর জন্যে গৌরব বোধ করে। এদের জন্যে গৌরবে দেশবাসীর বুক ফুলে ওঠে, সৈন্যবাহিনীর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে আসে তাদের। বস্তুত সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগের সৌজন্যে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এজন্যে দেশরক্ষাবাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ। সেনাবাহিনীর এই আত্মত্যাগের ঋণ অপরিশোধনীয়। দেশরক্ষা বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিক মৃত্যুর সাথে সম্মুখ-পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত হয়ে দেশের সীমান্ত পাহারায় রত। আদর্শবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় আদর্শ রক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী এই সেনাবাহিনী। এরা সর্বক্ষণ জনসাধারণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজতে ব্যাপৃত।

দেশরক্ষা বাহিনী শুধু দেশরক্ষার দায়িত্বই পালন করেন না—প্রয়োজনবোধে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও তাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। বস্তুত সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর নিষ্কলুষ চরিত্র একটি জাতির মস্তবড় সম্পদ। যৌবন উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ইস্পাত-কঠিন মনোবলে গড়া এই মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগী মুজাহিদদের জীবন কঠিন শৃঙ্খলায় বাধা। সমাজের অবাঞ্ছিত জঞ্জালের ধরা-ছোঁয়া থেকে এরা বহু দূরে। অবিচল আনুগত্যে এদের জীবন তৈরি। স্বচ্ছ-সাবলীল আচার-আচরণে সজ্জিত এদের মন। ন্যায়-নীতি ও সর্বোত্তম আদর্শবাদের ওপর অবিচল আস্থা রেখে এরা যদি নৈতিক চরিত্রেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণিত হন, তাহলে আদর্শ মানুষের কাতারে এরাই অগ্রবর্তী দল। কেবল নিজ দেশেই নয় বরং এরা হবে বিশ্ববরেণ্য। এই সৈন্যবাহিনীর সেনানায়কের আচার-আচরণকে বিশ্ববাসী ঈর্ষার চোখে দেখবে। প্রতিপক্ষের সেনাপতিকে এর সামনে ভাবগম্ভীর স্বরে বলতে বাধ্য হবে "তুমি মহান—তুমি মহান"।

আদর্শ সরকারি কর্মচারী

কি সরকারি কি বেসরকারি সকল কর্মচারীকেই কতকগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। কর্মচারী নিম্নপদস্থ হোক অথবা উচ্চপদস্থ তার স্বভাবে ও

www.pathagar.com

আচার-আচরণে এবং মানসিকতায় কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। যে কোন চাকরি গ্রহণ করার সময়ই একজন কর্মচারীকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। তাঁকে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে বিভাগ বা যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন জেনে শুনেই তা করেছেন। অতএব পদপ্রাপ্তির পর কর্তব্য-সম্পাদনে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি দেখানো উচিত হবে না। এ তো একটা অলিখিত (কখনো লিখিত) চুক্তিনামার মাধ্যমে তাঁকে চাকরিতে বহাল করা হয়েছে। অতএব একতরফা চুক্তি-লঙ্ঘন নীতি বিগর্হিত বলে প্রতীয়মান হবে। কাজের যোগ্যতা ছাড়াও একজন কর্মচারী হবেন কর্তব্যজ্ঞানে সচেতন। একনিষ্ঠভাবে তাঁর দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করতে হবে। কাজ সময় মতো করলে কোন কাজই পড়ে থাকে না। তাতে কর্মচারী নিজেও হালকা বোধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও উপকৃত হন। পক্ষান্তরে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে গোটা কাজই এলোমেলো হয়ে যাবে। এ ধরনের পরিস্থিতি কর্মচারী নিজের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উভয়ের জন্যেই অস্বস্তিকর।

সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা দায়িত্বশীল কর্মচারীর জন্যে অত্যন্ত জরুরি। একজন কর্মচারীর বেলায়ই শুধু এটা জরুরি এমন নয়। ব্যক্তি জীবনে এবং জাতীয় জীবনে এর অভাব পরিলক্ষিত হলে সে ব্যক্তি এবং সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে মুহূর্ত কালের জন্যে এদিক-সেদিক হলে একটা আস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া বর্তমান যুগে সময়ের মূল্য বেড়ে গেছে অত্যধিক। অতএব একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী তাঁর নির্ধারিত কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু করবেন এবং শেষও করবেন—এটাই অভিপ্রেত।

বিশ্বস্ততা কর্মচারীর একটি মহৎ গুণ। কর্মচারী নিম্ন পদস্থ হোন অথবা উচ্চ পদস্থ নিজ নিজ আওতার মধ্যে প্রত্যেক কর্মচারীকে বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে, তাঁর কাজের সাথে বহু লোকের স্বার্থ জড়িত। অতএব সামান্যতম অসাবধানতার জন্যে অনেক প্রকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তাঁকে আরো মনে রাখতে হবে যে, তাঁর কর্মতৎপরতার যেসব দিক জনস্বার্থের খাতিরে গোপন রাখা প্রয়োজন সেগুলো গোপন রাখতে হবে। কারণ, তিনি যে দায়িত্ব পালন করছেন সেটা পবিত্র আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করা কোন মতেই উচিত হবে না। এ আমানতের গুরুত্ব কম হোক অথবা বেশি, এতে খেয়ানত করলে গুরুত্ব অনুপাতেই বিপর্যয় ঘটবে।

প্রত্যেক কর্মচারীকে জনসাধারণের তথা গোটা জাতির সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি সেবক এই মনোবৃত্তিই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলবে এবং এই জনপ্রিয়তাই তাঁর দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রত্যেক কর্মচারীর

www.pathagar.com

এখতিয়ারেই কিছু না কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজ থাকে। তিনি যত নিম্ন পদস্থ কর্মচারীই হোন না কেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর কাজের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারেন, বিরক্ত করতে পারেন এবং বঞ্চিত করতে পারেন তার প্রাপ্য থেকে। আবার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারেন অনায়াসেই। এ সব দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে সকল কর্মচারীকে।

উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সম্পর্ক হবে সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক। নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবেন আবার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর নিম্নপদস্থ কর্মচারীর প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করবেন—এতে উভয়ের দায়িত্ব পালন সহজতর হবে।

কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করার জন্যে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীরা অসঙ্গত উপায়ে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে চাইলে গোটা প্রশাসনযন্ত্রই অচল হয়ে পড়বে, তাতে জনসাধারণকেই অসীম দুর্ভোগ সইতে হবে।

সরকারি বেসরকারি কর্মচারীদের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি আলোচনা করা হলো। পরিশেষে বলে দেয়া প্রয়োজন যে, কর্মচারীদের সততা, একনিষ্ঠতা, কর্তব্য পরায়ণতা প্রভৃতি গুণ থাকলে তাঁরা সমাজের সর্বস্তরের লোকের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করতে পারবেন। তখন এই কর্মচারীদেরকে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানুষ আখ্যা দেবে সমাজ।

আদর্শ রাষ্ট্রদূত

বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় অগ্রগতির সাথে সাথে সারা বিশ্ব যেন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে সামান্যতম আওয়াজ হওয়ামাত্র বিশ্বের অপর প্রান্তে সেটা প্রতিধ্বনিত হয়। আজ আর কোন দেশ একা বাস করতে পারে না। একলা চলার যুগ কয়েক যুগ আগেই খতম হয়েছে। আজ বিশ্বমানব বিশ্বরাষ্ট্র (World State) গঠন করার সম্ভাব্যতা চিন্তা করছে। মানুষ আজ ভৌগোলিক সীমারেখা ডিঙিয়ে, ভাষা-বর্ণের পার্থক্য তুচ্ছ করে এগিয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু তাহলে তো কোন দেশ তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে রাজি হচ্ছে না এখনো। এটা বোধ হয় কিছুটা আত্মগৌরবের অহমিকা আর কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক। অবশ্য উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যও এর অন্যতম কারণ। যাই হোক, বর্তমানে প্রত্যেক দেশ স্বীয় স্বার্থে অপর দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। এই স্বার্থ প্রধানত বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক। এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করার প্রয়োজন। অতএব রাষ্ট্রদূতের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূত বিদেশে একটা দেশের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করেন। একটা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টি-সভ্যতার একটা মোটামুটি ছবি তুলে ধরেন তিনি বিদেশে। এই রাষ্ট্রদূতের যোগ্যতা, আচার-আচরণ, জীবনযাপনের ধারা সবকিছু বিদেশীদের চোখে পড়ে। এ থেকে একটা দেশের সামাজিক জীবন ও জাতীয় জীবনের খানিকটা রূপ ধরা পড়ে বিদেশীর কাছে। মূলত এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাজুক দায়িত্বে রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত।

কোন দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও আজ আর অপর দেশের কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি যখন বিদেশে যান অথবা সেখানে অবস্থান করেন, তাঁকে নিজ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্মরণ রেখে সেখানে অবস্থান করা উচিত। তাঁর দেশ যদি কোন বিশেষ আদর্শবাদে বিশ্বাসী হয়, তাঁকে সে আদর্শবাদ অনুসারে দেশের প্রতিনিধিত্ব করাই যুক্তিসঙ্গত। কারোর সাথে পাল্লা দিয়ে জাঁকজমক দেখানো অনুচিত। তাঁর দেশের প্রকৃত অবস্থা সকলেরই তো জানা। প্রকৃতপক্ষে আচার-আচরণ, আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাই রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের চরিত্রে যেসব গুণ থাকলে তারা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত 'আদর্শ মানুষ' আখ্যা পেতে পারে, উপরোল্লিখিত আলোচনায় তার একটা মোটামুটি আভাস দেয়া হয়েছে। সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গুণসম্পন্ন লোকের ঐকান্তিক বাসনা পোষণ করেন এতে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব গুণ অর্জন করার ও আয়ত্তে আনার উপায় কি ? অনুরোধ-উপরোধ ও ভয়-ভীতির দ্বারা কারোর চরিত্রে এসব গুণ জন্মানো কি সম্ভব ? আসছে অধ্যায় এই প্রশ্নের মীমাংসা করারই প্রয়াস। খোলা মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

আদর্শ মানুষ গঠনের উপায়

নৈতিক চরিত্র একটা মানসিক অনুভূতি—একটা ভাবাবেগ। এর সম্পর্ক মনের সাথে। একটা বিশেষ মানসিকতা ও আত্মসচেতনতাই মানুষকে নৈতিকতাবোধ-সম্পন্ন হতে সাহায্য করে—নিজকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। এই চেতনা কারো মনের ওপর জোর করে চাপানো যায় না। বরং জোর করতে গেলে বহু ক্ষেত্রে মন বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়। তাই আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজকে তৈরি করতে হলে প্রয়োজন বিশেষ একটি মানসিক প্রস্তুতি—মানসিক কাঠামো। মনকে সুন্দরভাবে তৈরি করতে হবে। বলিষ্ঠ এই মনে থাকবে না কোন সংশয়। জীবন ও জগত সম্পর্কে স্বাভাবিক হাজারো প্রশ্নের উত্তর মনের কাছে থাকবে পরিষ্কার।

নৈতিক চরিত্র বা সচ্চরিত্রের এই স্থিতিশীল চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে বলিষ্ঠ সংশয়মুক্ত মন ও মানসিকতা সৃষ্টির জন্যে তিনটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার।

প্রথমত এই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত এই বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে হবে এবং তৃতীয়ত আল্লাহ্ প্রেরিত বার্তাবহ কর্তৃক দে'য়া আল্লাহ্‌র মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে।

এখন আমরা এই তিনটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

এই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ

মানুষ কি করে এখানে এলো ? কে তাকে নিয়ে এলো এই কোলাহল মুখরিত ধরাপৃষ্ঠে ? পাখি-ডাকা, ফলে ভরা, ফুলে ভরা এই সবুজ শ্যামল পৃথিবীতে কেনই বা সে এলো ? এখানেই কি তার জীবন শেষ ? যদি শেষ না হয় তবে এর পর সে কোথায় যাবে ? এ জীবনের পরিণাম কি ? সে এখানে যে ভালো কাজ করেছে তার পরিপূর্ণ পুরস্কার কি সে এখানে পাবে ? আবার সে যে মন্দ কাজ করলো তার পরিপূর্ণ শাস্তি সে কোথায় ভোগ করবে ? অপর লোকের সাথে, গোটা পরিবেশের সাথে তাকে কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ? এ ধরনের হাজার প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে মানুষকে প্রথমে। অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে তাকে বুঝতে হবে কতগুলো বিষয়।

www.pathagar.com

আদিকাল থেকে—না জানি কত কোটি বছর কেটে গেছে এর মাঝে—পূর্ব-আকাশে প্রত্যহ সকালবেলা সূর্য নামের অগ্নি-গোলকটি তাপ বিকিরণ করছে মাটির মানুষকে। আবার কোথায় যেন লুকিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যেবেলা—ক্লান্তি নেই তার এই চলার পথে। রাতের আঁধারে তারকার ফুল ঝক্‌ঝক করে ওঠে আকাশ-উদ্যানে। শীতল স্নিগ্ধ আলো দান করে চাঁদ। মাতিয়ে তোলে দুনিয়াবাসীকে। কার উদ্দেশে এই মনমাতানো সমারোহ ? মাটির পৃথিবীতে উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীকুল যখন হাঁপিয়ে ওঠে পানির জন্যে, শূন্যলোক থেকে বৃষ্টিধারা নেমে আসে তৃষ্ণার্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দ্বারপ্রান্তে। এমনিভাবে একই ধারায় বয়ে চলছে সীমাহীন বিশ্বপ্রকৃতি।—চলার গতিতে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই তার।

মানুষ তার সুঠাম দেহগঠনের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে, কি সুন্দরভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সংযোজিত করা হয়েছে। যেখানে যে অংশ রাখলে এবং যে মাপে সন্নিবেশ করলে সুন্দর হয় তার অবয়ব, সহজ সরল হয় সেগুলোর সঞ্চালন, সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে তার এই সুন্দর দেহখানি। আবার এই আকর্ষণীয় দেহখানির সাথে কোত্থেকে যেন এক অদৃশ্য বেতার-সংযোগ জুড়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। বোতাম টিপে কে যেন এই দেহরূপী মেশিন চালু করে দেন। আবার বোতাম টিপে দিলে এর গতি বন্ধ হয়ে যায়।

এই যে মানুষ—কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে যার বাস, তার বেঁচে থাকার জন্যে আহার্যের প্রয়োজন ; কিন্তু এই আহার্য কিভাবে যোগাড় হয় ? মাটিতে বীজ বপন করে দিলেই কি আপনা-আপনি চারা গজায় ? একটি বীজ মাটির কোলে আশ্রয় নেয়ার পর তার গর্ভ থেকে একটা সবুজ চারা গাছ গজিয়ে উঠতে অনেক শক্তি কাজ করে। আলো-বাতাস ছাড়াও আরো বহু উপাদান এটার পেছনে কর্মরত রয়েছে বলেই মাটির বুক চিরে গাছটি বেরিয়ে আসে। শুধু আলোর কথাই ধরা যাক। সূর্য আলো দান করে ; কিন্তু সূর্যের অবস্থান লক্ষণীয়। হিসেব করে দেখলে বুঝা যায়, পৃথিবী থেকে যতটুকু দূরে সূর্যকে রাখা প্রয়োজন ততটুকু দূরে রাখা হয়েছে তাকে। এর চাইতে আরো দূরে রাখলে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হিমে জমাট হয়ে যেতো। আবার এর চাইতে আরো কাছে রাখলে এখানকার সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো।

ভূমির বহিরাবরণ, যাকে ভূত্বক (Crust) বলা হয়, নানা প্রকার রাসায়নিক উপাদানে সমৃদ্ধ। এতে আছে অম্লজান, সিলিকন, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টিটোনিয়াম, হাইড্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস ও সালফার। ভূত্বকে এসব উপাদানের মাত্রা সমান নয়। কোনটার পরিমাণ বেশি আবার কোনটার কম। সর্বোচ্চ পরিমাণ অম্লজানের—৪৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন সালফারের—০·১ শতাংশ ; কিন্তু একটি ঘুমন্ত বীজকে জাগিয়ে তুলতে এই উপাদানগুলোই যথেষ্ট নয়। বাইরের আরো কিছু শক্তির প্রয়োজন। আলো, বাতাস ও পানির প্রয়োজন এগুলোকে চাঙা করে তুলতে। এভাবে সবগুলো উপাদান নিজ

www.pathagar.com

নিজ কর্তব্যে কর্মরত হলে পর একটি বীজের গর্ভে ঘুমন্ত চারা গাছটি বেরিয়ে আসে খোলা পৃথিবীর বুকে এবং হেসে-খেলে বড় হতে থাকে মানুষ নামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সেবার জন্যে।

আমরা প্রত্যহ যে ফল-মূল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি এগুলোর প্রতি নজর করলে অবাক হতে হয়—কি সুন্দর এগুলোর গঠনপ্রণালী! প্রায় সকল প্রকার ফল-মূলের গায়েই একটা আবরণ দিয়ে এগুলোকে সুরক্ষিত করা হয়েছে বাইরের কলুষ (Contamination) থেকে।

আমাদের এই গ্রহ—পৃথিবীটাকেই দেখুন। যতটুকু ঢালু করে রাখলে এটা মানুষের বাসোপযোগী হতে পারে ততটুকু ঢালু করেই রাখা হয়েছে। এর চাইতে একটু বেশি বা কম ঢালু হলে এর ওপর বাস করা যেতো না—মোটেই ঢালু না হয়ে সমতল হলে পানির অভাব হতো, আবার আরো বেশি ঢালু হলে প্রত্যহ কয়েকবার প্লাবনে ভেসে যেতো আমাদের আবাসগুলো।

আমরা যে পানি পান করি এই পানি কিভাবে তৈরি তাও লক্ষ করার বিষয় ? দু'ভাগ জলজান (হাইড্রোজেন) ও একভাগ অম্লজান (অক্সিজেন) গ্যাসের সংমিশ্রণে পানি তৈরি হয়। আপনি এই উদ্‌জান ও অম্লজান গ্যাস দেখেছেন ? কখনও দেখেন নি। কেউ দেখেনি এবং কোন দিন দেখবেও না ; কিন্তু দু'টো অদৃশ্য গ্যাস উপরোক্ত পরিমাপে মিলিত হয়ে পানিরূপ পদার্থ আপনাকে উপহার দিচ্ছে যার অপর নাম 'প্রাণ'।

কি আশ্চর্য! হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস অফুরন্ত ; কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিমাপে এই দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে যে পানি তৈরি হয় সে পানির পরিমাণ বেশিও নয় কমও নয়।

এই যে আবহমণ্ডল, এই বায়ুমণ্ডলের একটু খোঁজ নিলে বুঝা যায়, পৃথিবীর বুকে প্রাণীকুল ও উদ্ভিদরাজি বেঁচে থাকার জন্যে যেসব গ্যাস-বাষ্পের প্রয়োজন, পৃথিবী থেকে প্রায় পাঁচ শত মাইল ঊর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত সে গ্যাস পরিব্যাপ্ত। এই গ্যাসের একটা অত্যন্ত পুরু পর্দা বিরাজ করছে বায়ুমণ্ডলে। প্রতিদিন প্রায় দু'কোটি উল্কা প্রতি সেকেন্ডে ত্রিশ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। এই উল্কাগুলো দু'রকমের। কতগুলো প্রধানত পাথর জাতীয় আবার কতগুলো লৌহ জাতীয়। সর্ববৃহৎ উল্কার ওজন একশত টন পর্যন্ত হতে পারে। ছোট্ট ছোট্ট উল্কাগুলো গ্যাস-বাষ্পের পর্দায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বস্তুত উল্কার আঘাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যেই বাষ্পীয় পর্দার ব্যবস্থা।

ঐ দূর-আকাশের মহাসাগরে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো ভেসে চলছে না-জানা যুগ থেকে, কারোর সাথে কারোর ধাক্কা লাগছে না, না সংঘর্ষ হচ্ছে পরস্পরের। অথচ এগুলোর অবস্থা এই যে, আকাশের গায়ে বৃহদাকার এমন বহু নক্ষত্র রয়েছে—স্যার জেমস জীনের মতে—যার অভ্যন্তরে আমাদের পৃথিবীর মতো লাখ লাখ

www.pathagar.com

পৃথিবী ঢুকালেও তার মধ্যে আরো ফাঁকা জায়গা থেকে যাবে। কেউ যদি আকাশের তারকাগুলো গণনা করে সংখ্যা নির্ণয় করতে চায়, তাহলে সে শুনে রাখুক ঃ পৃথিবীর সকল সাগর তীরে যত বালুকণা আছে তারকাগুলোর সংখ্যাও তত—এবার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ হবে বৈকি! (Sir Games Geans-এর The origin of life on Earth প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

এমনিভাবে, কি প্রাণীজগত কি উদ্ভিদজগত অথবা সৌরজগত, যেদিকেই তাকানো যায়, চোখে পড়ে এক অদ্ভুত রহস্যাবৃত বিশ্বপ্রকৃতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এই রহস্যময় বিশ্বের নতুন নতুন বিস্ময়কর দ্বার উদ্ঘাটিত হচ্ছে মানুষের সামনে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে মনে হয় কোন অদৃশ্য হাত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোন অদৃশ্য শক্তি বিশ্বপ্রকৃতিকে এমনি করে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করছেন। এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই এই পরিচালনায়। কোন স্থূল বুদ্ধির লোক যদি জেদ ধরে বলে, এগুলো আপনা-আপনি চলছে, এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার পেছনে কেউ নেই, তাহলে বলতে হয় : একটি বিরাটকায় জাহাজ বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা সাগরের এপারে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে ওপারে গিয়ে খালাস করছে, আবার ওপার থেকে মাল বোঝাই করে এপারে এনে নামিয়ে দিচ্ছে। জাহাজটি নিজে নিজে চলছে, মাল বোঝাই ও নামানো দু'টিই নিজে নিজে হচ্ছে। তবে এটাকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যাবে ? অতএব স্বীকার করতেই হবে, এই বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের পেছনে একজন নিয়ন্ত্রণকর্তা ও মহাপরিচালক অবশ্যই আছেন।

বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিরূপণ

এই পর্যায়ে মানুষের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় সেগুলো হচ্ছে : বিশ্বপ্রকৃতির এই সাজ-সরঞ্জাম, এই সমারোহ আদিকাল থেকে এই নিরবচ্ছিন্ন গতিধারা কার জন্যে ? কিসের জন্যে ? কার মন-ভোলাবার জন্যে এই নিরলস প্রচেষ্টা ? কার সেবায় নিবেদিত গোটা প্রকৃতি জগৎ ? কার আদেশ পালনে এই একাগ্রতা ? কার প্রতি এই ঐকান্তিক আনুগত্য ?

সুস্থ ও ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করলে এতগুলো প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে :

স্রষ্টার অনুগত গোটা প্রকৃতি জগত বিশ্বমানবের সেবায় প্রতিনিয়ত নিয়োজিত।

এরপর ধারাবাহিক কতকগুলো প্রশ্ন জাগে, যেগুলোর সঠিক উত্তর জানতে চায় প্রত্যেকটি উৎসুক মন।

০ বিশ্বপ্রকৃতিকে মানব সেবায় নিয়োজিত করার পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য কি ? কেন মানুষের এই গৌরব ?

www.pathagar.com

এর উত্তর হচ্ছে—জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির সেরা, সে-ও যাতে আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে স্রষ্টার প্রতি নিশ্চিন্তে-নিরুদ্বেগে এই জন্যেই বিশ্ব প্রকৃতিকে তার সেবায় নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। মূলত এতে করে স্রষ্টা দেখতে চান জ্ঞান-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় কে তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং কে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করে এই পৃথিবীর বুকে।

০ স্রষ্টার অনুগত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করলে কি লাভ?

—এতে দু'টো লাভ। মৃত্যুর পূর্বে এবং পরে দু'জায়গায়ই এতে লাভ। মৃত্যুর পূর্বে এই পার্থিব জীবনে স্রষ্টার অনুগত হয়ে কাজ করলে নিজের ও সমাজের উভয়ের কল্যাণ। স্রষ্টা চান মানুষের পার্থিব জীবন হোক শান্তিপূর্ণ, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। অতএব এই মর-জগতে মানুষের সকল কাজ স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হলেই সমাজ জীবনে সমতা রক্ষা করা সম্ভব। আবার এখানকার জীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কল্যাণকর হলেই মৃত্যুর পরের জীবনও সুখময় হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে অপর একটা প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন।

০ বিশ্বস্রষ্টাকে কি নামে নামকরণ করলে তাঁর গুণাবলীসহ সে নাম অর্থবোধক হতে পারে এবং সে নামে তাঁকে ডাকা যেতে পারে?

রহস্যাবৃত সৃষ্টিকে অবলোকন করলে হতবুদ্ধি হয়ে যায় মানুষ। বৈচিত্র্যময় দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অবনমিত হয়ে আসে মস্তক। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বলোকের উর্ধ্বে মহাশক্তিধর বিশ্বনিয়ন্তার আশ্রয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধাবমান হয় মন। সুতরাং যুগ-যুগান্তর থেকে স্রষ্টাকে যেসব নামে ডাকা হয়েছে সেসব নাম এসব গুণের অর্থবোধক। সিরিয়াক, বেবিলনিয়া ও হিব্রু ভাষায় ইলুয়া, আল্হ্ এবং ইল্হ্ ইত্যাদি শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো উপরোল্লিখিত অর্থবোধক। ভাষার ক্রমোন্নতির সাথে ধ্বনি ও উচ্চারণের দিক থেকে আল্হ্ এবং ইল্হ্ শব্দদ্বয় সহজ বিবেচিত হয় এবং এর সাথে নির্দিষ্টসূচক অক্ষর আল্ লাগিয়ে আল্লাহ্ উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হতে থাকে। উচ্চারণের দিক দিয়ে এটাই সহজ-সরল। আমাদের আলোচনায় এরপর বিশ্বস্রষ্টাকে আল্লাহ বা আল্লাহ্ নামেই ডাকবো।

আল্লাহ্-প্রেরিত বার্তাবহ কর্তৃক দেয়া আল্লাহ্-মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসরণ

এ পর্যায়ে কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর জেনে নেয়া দরকার।

০ আল্লাহ্-মনোনীত পথ ও পন্থা জানার উপায় কি?

—প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ পাক মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ও দ্রব্যসামগ্রী সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি যুগে যুগে মহাপুরুষদের বেছে নিয়ে তাঁদের কাছে বাণী পাঠিয়েছেন। এই মহাপুরুষরা আল্লাহ্র বাণী লোকদের

www.pathagar.com

শুনিয়েছেন এবং তদানুসারে কাজ করেও দেখিয়েছেন। এভাবে কথা ও কাজ উভয়ের মারফত হাতে-কলমে মানুষকে শিখিয়েছেন কি করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

০ পদমর্যাদার দিক দিয়ে এই বার্তাবহ মহাপুরুষরা কি নামে পরিচিত ?

—এই মহাপুরুষরা ছিলেন আল্লাহ্‌র বার্তাবহ। অতএব এই গুণবাচক নামেই তাঁরা পরিচিত। (আমরা এরপর আগামী আলোচনায় বার্তাবহ শব্দের পরিবর্তে রাসুল অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করবো। ধ্বনি ও উচ্চারণ উভয় দিক থেকে এই দু'টি শব্দ সহজ, সরল এবং উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে বার্তাবহ)।

০ নবী-রাসুলগণ সত্যি সত্যি আল্লাহর বার্তা বহন করে এনেছেন সেকথা কি করে বিশ্বাস করবো ?

—বিশ্বাস করার জন্যে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে :

এক. সৃষ্টির প্রথম থেকে সমাজ বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত যুগে যুগে যেসব নবী-রাসুল এসেছেন তাঁরা সকলেই একই কথা বলেছেন। সর্বপ্রথমে যে নবী এলেন তাঁর কথা এবং সর্বশেষ যিনি এলেন তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোন বৈষম্য অথবা পার্থক্য নেই। সর্বপ্রথম যিনি এলেন তিনি বললেন : আল্লাহ্ এক—অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক বা অংশীদার নেই। মানুষ তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করুক এটাই তিনি চান। তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করার পথ ও পদ্ধতি জানবার উপায় তাঁর প্রেরিত রাসুলের মাধ্যম। সর্বশেষে যে রাসুল এলেন তিনিও এই একই কথা বললেন। রাসুলের দেয়া এই জীবনাদর্শ এক দিকে রাখুন। অপরদিকে বিচার করে দেখুন জীবন সম্পর্কে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ। অন্য দার্শনিকরাও বিভিন্ন যুগে মানব-জীবন সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এক যুগের দার্শনিক মতবাদের সাথে পরবর্তী যুগের দার্শনিক মতবাদের কোন মিল নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে মানব-জীবনকে যে আংশিক পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন সে অনুসারেই একটা জীবন-দর্শন খাড়া করেছেন। অতএব এর কোনটাই ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জীবন-দর্শনের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে স্রষ্টা রাসুলদের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে দর্শন পেশ করেছেন সর্বযুগে সেটাই ব্যাপকভিত্তিক ও পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন বলে প্রতীয়মান।

দুই. রাসুলদের সকলেই নিষ্কলঙ্ক ও নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। অবশ্য তাঁরা সকলেই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন—মানুষ হিসেবেই সকল নবী-রাসুল এসেছেন দুনিয়ায় আর এটাই হলো যুক্তিযুক্ত। কারণ তাঁরা মানুষ ছিলেন বলেই মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন এবং মানব-জীবনের সকল সমস্যার সম্যক সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

যে সমাজে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন আল্লাহ্ পাক কর্তৃক রাসুল মনোনীত ও বিঘোষিত হওয়া পর্যন্ত সে সমাজের লোকদের মধ্যেই তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন অতিবাহিত হয়েছে ; কিন্তু এ সময় তাঁদের আচার-আচরণের ও চরিত্রের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায় নি। বরং সমাজের সকল স্তরের লোকেরাই তাঁদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে অতি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের বরণ করেছে। যে লোক পরিণত বয়স পর্যন্ত মানবিক গুণাবলীর সবগুণে সমৃদ্ধ, রাসুল মনোনীত হবার পর হঠাৎ করে তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতেও পারেন না।

তিন. আল্লাহ্ পাক কর্তৃক রাসুল মনোনীত হবার পর আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে তাঁরা যখন কাজ শুরু করেছেন, সমাজের চরিত্রহীন কায়েমী স্বার্থবাদীরা তখন তাঁদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছে ; কিন্তু এ নির্যাতন তাঁরা ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করে গেছেন। এ নির্যাতনের প্রতিশোধ নেননি কখনো বরং সর্বক্ষণ লোকদের মঙ্গল কামনা করেছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগের জন্যে কোন প্রতিদানও চান নি তাঁরা। তাঁরা বলেছেন : আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। প্রতিদান তো আল্লাহ্পাকই দেবেন আমাদেরকে। আমরা চাই তোমরা সৎ জীবনযাপন কর আর এটা তো তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। নবী-রাসুলদের এই নিঃস্বার্থপরতা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, সত্য নবী ও সত্য রাসুল হিসেবেই তাঁরা মানুষের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

০ এই নবী-রাসুলদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে এসেছিলেন এবং সর্বশেষ রাসুল কে ছিলেন ?

—সর্বপ্রথম এলেন হযরত আদম (আ:) এবং সর্বশেষে এলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স:)। চৌদ্দশত বছর আগে শেষনবী বিশ্ববাসীকে যে জীবনধারা বাতলে গেছেন তা শাশ্বত ও সার্বজনীন। তাতে আছে গোটা মানুষের সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান। মূলনীতি নির্ধারক এই সমাধানসমূহ আল্লাহ্র নির্দেশে রচিত বিধায় সহজ-সরল ও কল্যাণকর।

০ চৌদ্দশত বছর আগের মানুষ আর আজকের মানুষ কি সমান ? মানব সভ্যতা এগিয়ে গেছে অনেক দূর। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে রকেট গতিতে মানুষ এগুচ্ছে। আজকের মানুষ চাঁদে ভ্রমণ করছে এবং মঙ্গল গ্রহে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুরনো যুগের সব ধ্যান-ধারণা বদলে গেছে। এ যুগে চৌদ্দশত বছর আগেকার জীবনধারা সময়োপযোগী কি করে ?

—এবারকার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঠিক জবাব পেলে আপনা আপনি অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রথমে প্রশ্ন হলো চৌদ্দশত বছর আগেকার মানুষ আর আজকের মানুষ কি সমান ? প্রকৃতপক্ষে সমানই।

যুগ পরিবর্তন হয়েছে সত্যি ; কিন্তু যুগের মানুষের পরিবর্তন হয়নি মোটেই।

www.pathagar.com

মানুষের জন্মপদ্ধতি তো অপরিবর্তিতই রয়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণারও কোন পরিবর্তন হয় নি। সে যুগের মানুষেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল আজকের মানুষেরও আছে। খাদ্য তালিকায় নতুন নতুন খাদ্যদ্রব্য যুক্ত করা হয়েছে মাত্র। এমন তো নয় যে, সেদিন মানুষ বিষ পান করতো এবং অপুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করতো আর আজ সেটা করে না। এমনও নয় যে, সেদিনকার বিস্বাদ খাদ্য আজ সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত হয়েছে। খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীরও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সেদিনও অধিকাংশ খাদ্য আগুনের তাপে তৈরি করা হতো, আজও তাই হয়। সেদিন খাদ্য প্রস্তুত হতে একটু বেশি সময় লাগতো, আজ চাপচুল্লি (Pressure Cooker) অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য তৈরি করে দেয়। অতএব বুঝা গেল, মানুষের জন্ম ও জীবনের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য সেদিন যা ছিল আজো সেটাই আছে। যোগাযোগ-পদ্ধতির উন্নতি হয়েছে বটে। সেদিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে অধিক সময় লাগতো, আর আজ ত্বরিত গতিতে তা সম্পন্ন হয়। সেদিন কোথাও খবর পাঠাতে হলে মানুষের মারফত পাঠাতে হতো, আজ ঐ একই খবর বেতার মারফত পাঠানো হয়। সেদিন কারুর বক্তৃতা-ভাষণ শুনতে হলে তার কাছে যেতে হতো, আজ রেডিও মারফত ঘরে বসে শোনা যায় ঐ একই বক্তৃতা। সেদিন কাউকে দেখতে হলে কাছে গিয়ে তাকে দেখতে হতো, আর আজ ঘরে বসে সে একই লোককে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় ও তাঁর বক্তৃত শোনা যায়। সেদিন কোন জায়গায় ভ্রমণ করতে হলে পথে মাসাধিক কাল কাটাতে হতো, আজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে জায়গায় পৌছানো যায়। এমনিভাবে দেখা যায়, যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি, যোগাযোগ ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

সেদিনকার শত্রুতা ও মিত্রতায় যে মানসিকতা পরিলক্ষিত হতো, আজকের শত্রুতা ও মিত্রতায় যে মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় এর মধ্যেও কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সেদিনকার মিত্রতা ছিল গাঢ়-গভীর ও আন্তরিকতাপূর্ণ এবং শত্রুতা ছিল ক্ষীণ-হালকা, পক্ষান্তরে আজকের শত্রুতা হচ্ছে গাঢ়-গভীর ও ভয়াবহ এবং মিত্রতা হচ্ছে ক্ষীণ-হালকা ও অন্তঃসারশূন্য। সেদিন এক আঘাতে একটি লোক প্রাণ হারাতো, আজ এক আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে একটি দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতএব সেদিনকার শত্রুতা চরিতার্থ করার পদ্ধতির ভয়াবহতা বেড়েছে ; কিন্তু প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার যে মানসিকতা তা একই রয়েছে। মিত্রতা প্রদর্শনের মনোবৃত্তি একই রয়েছে তবে আন্তরিকতা বহুলাংশে কমেছে।

এমনিভাবে আজকের মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়াশের দিক দিয়ে আজকের মানুষ

www.pathagar.com

তখনকার মানুষের চাইতে অনেক বেশি আরাম ভোগ করছে এবং আরো আরামদায়ক জীবনের জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর কোণে কোণে। আজ মানুষ দূর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে গিয়ে বসতি স্থাপন করার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু সেদিনকার মানুষের ও আজকের মানুষের মন ও মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। ফেরাউন নমরূদ সব যুগেই ছিল, আজো আছে। তারা কখনো চেঙ্গিস-হালাকু নামে আবির্ভূত হয় আবার কখনো হিটলার-মুসোলিনীর রূপ নিয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে। আবার বিশ্বপ্রেমিক কখনো মূসা-ঈসা (আঃ) নাম নিয়ে আসেন আবার কখনো আবুবকর-ওমর (রাঃ) ও নাসিরুদ্দীন রূপে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে যান দুনিয়ার মানুষের জন্যে। অতএব সেকালের মানুষ ও এ কালের মানুষ একই মানুষ। তফাৎ শুধু বাহ্যিক জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা ও আধিক্যের। ভিতরের মানুষ একই—কোন তফাৎ নেই।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি যে, চৌদ্দশত বছর আগে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) মানুষের মন-মানসিকতা ও প্রবৃত্তির প্রতি নজর রেখে মানব-জীবনের মূল সমস্যাবলী সামনে রেখে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের যে মূলনীতি পেশ করেছেন সেটা শাশ্বত ও সার্বজনীন। যতদিন এই পৃথিবীর বুকে মানুষ বাস করবে ততদিন এই মূলনীতি সর্বযুগে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবনে যে সব সমস্যা আছে এই মূলনীতিতে খুঁজে পাওয়া যাবে সেগুলোর সত্যিকার ও সময়োপযোগী সমাধান।

এবার আরো কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

০ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে পার্থিব জীবনযাপন করলে দু'টো লাভ—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, এর তাৎপর্য কি ?

—পার্থিব জীবনের লাভ সম্পর্কে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসুলের মারফত প্রাপ্ত জীবন-বিধান অনুসারে জীবনযাপন করলে ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে শৃঙ্খলা বজায় থাকতে পারে এবং শান্তিপূর্ণ হতে পারে এখানকার জীবন।

মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক রাসুলের মারফত সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কৃত করা হবে এবং অসৎকর্মশীলদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। বস্তুতঃ পরজীবন সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। পরজীবন সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, কারণ :

প্রথমত মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই তার প্রত্যেকটি কাজের বিচার হওয়া উচিত। তার কর্মতৎপরতার প্রত্যেকটি কাজ যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে তার সে কাজের জন্যে পুরস্কার পাওয়া উচিত। পৃথিবী হচ্ছে কর্মস্থল। কর্মফল লাভের জায়গা অন্যত্র থাকা উচিত, যেখানে সৎকর্মের পরিপূর্ণ পুরস্কার এবং অসৎ কর্মের শাস্তি

www.pathagar.com

দেয়া সম্ভব হয়। ভালো ও মন্দ এদু'টোর সাথে সমান ব্যবহার করা যেতে পারে না। দু'টোকে সমান মর্যাদা দেয়া হলে অবিচার করা হবে সৎকর্মশীল ব্যক্তির প্রতি। আল্লাহ্ কারোর প্রতি অবিচার করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত সৎকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান এবং অসৎ কর্মের পূর্ণ শাস্তি পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবনে দেয়া সম্ভব নয়। ধরুন একটি লোক জীবন ব্যাপী পরোপকার করলো। লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করলো সে। ত্যাগ স্বীকার করলো সারা জীবন। তাকে প্রতিদান স্বরূপ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় কতটুকু প্রতিদানই বা দেয়া সম্ভব। অপর একটি লোক সারা জীবন অন্যায় কাজ করলো। লাখ লাখ মানুষ নিজে হত্যা করলো অথবা কারোর দ্বারা করালো। তাকে কতটুকুই বা শাস্তি দেয়া সম্ভব এখানে। তাকে ফাঁসি দিয়ে অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিলেও তাকে পুরো শাস্তি দেয়া হলো কি ? আর সে যদি পালিয়ে যায় তবে তো আর শাস্তির প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, এমন এক জায়গা—এমন এক পরিবেশ থাকতে হবে যেখানে পুরস্কার অথবা শাস্তি দু'টোই সৎকর্ম অথবা অসৎ কর্মের পরিমাণ অনুসারে দেয়া সম্ভব এবং এমন এক বিচারক থাকা দরকার যিনি ইচ্ছা করলে সৎকর্মের জন্যে পুরস্কার মাত্রা বাড়াতেও পারেন।

তৃতীয়ত মানুষের মনে, বিচারদিনের চেতনাবোধ সদাজাগ্রত থাকলেই সে তার জীবনের চলার পথে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। এতে নৈতিকতাবোধ জাগরুক থাকে। সকল কাজের জন্যে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে—একমাত্র এই অনুভূতিই মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। মানুষ আইনকে ফাঁকি দিতে পারে, পুলিশের আড়ালে অন্যায় কাজের পরিকল্পনা করতে পারে, রাতের আঁধারে জুলুম-অত্যাচার ও সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং সকল প্রকার দুষ্কর্মে উৎসাহ বোধ করতে পারে ; কিন্তু রাতের অন্ধকার অথবা নির্জন-নিথর স্থান যেখানেই সে থাকুক, যে অবস্থায় সে থাকুক, একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী প্রতিনিয়ত তাকে দেখছেন, তার প্রতিটি কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখছেন এবং তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন—তিল পরিমাণ ভালো কাজ ও তিল পরিমাণ মন্দ কাজ কোনটাই বাদ যাবে না—এই অনুভূতি সর্বদা মনে জাগরুক থাকলে সে কখনো অন্যায় কাজে পা বাড়াতে পারবে না। তখন সে অন্যায় কাজে পাবে ভয় এবং ন্যায় কাজে পাবে উৎসাহ।

০ মানুষ মরার পর তাকে মাটিতে পুঁতে ফেললে তার অস্থি-মজ্জা সবই তো বিলীন হয়ে যায় মাটিতে। মৃত ব্যক্তিকে পুড়ে ফেললে ছাই হয়ে যায়। এই মানুষ দ্বিতীয়বার জীবিত হবে এবং তার ভালো-মন্দ সব কাজের বিচার হবে এটা কি করে সম্ভব ?

—পারমাণবিক পর্যবেক্ষণে আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, অণু-পরমাণু রূপ বদলায় ধ্বংস হয় না। অতএব মানুষের শরীর মাটিতে মিশে যাক অথবা দাহিত

www.pathagar.com

হোক তাতে দেহের রূপ বদলাবে ; কিন্তু দেহাবশেষ ধ্বংস হবে না। তাছাড়া, যে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়ার দ্বারা মানব-দেহ সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আদর্শ মানুষ সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারা

এ পর্যন্ত আলোচনা করা হলো তাতে প্রতীয়মান হলো যে, মন ও দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক গতি নির্ধারিত হয় তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রত্যয় ও তা মেনে চলার ওপর।

এক : স্রষ্টাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস।

দুই : স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের পথ ও পন্থা জানবার জন্যে তাঁর প্রেরিত বার্তাবহের নেতৃত্ব গ্রহণ।

তিন : প্রতিটি কর্মের জবাবদিহি সম্পর্কে সদা-জাগ্রত অনুভূতি সৃষ্টি।

বস্তুত মন তথা অন্তঃকরণ হচ্ছে মানুষের পরিচালিকা শক্তি। হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ও রসনা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ হচ্ছে অন্তঃকরণের আজ্ঞাবহ। মন যেভাবে চাইবে সেভাবেই এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। শরীরটা যেন একটা মটরযান আর মন তার চালক (Driver)। এই মোটরযানটি চালক যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। মোটরযানের নিজস্ব কোন অভিরুচি নেই। চালকের অভিরুচি অনুসারেই সে কাজ করে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই এই মোটরযানরূপী মানুষের স্থূল দেহের।

মানুষের প্রকৃত অবস্থা যেহেতু এই, তাই মানুষকে আদর্শ মানুষ রূপে পেতে হলে প্রথমে তার মনকে আদর্শ মন বানাতে হবে ; কিন্তু মন স্বাধীন। বৈষয়িক দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যে মনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বশে আনতে পারে। জোর করে তাকে বশে আনা যায় না—দমিয়ে রাখা যায় না। দমিয়ে রাখলেও সুযোগ পেলেই আবার তার আসল রূপ প্রকাশ পায়। মনকে বশে আনার শুধুমাত্র একটা পথই আছে, সেটা হচ্ছে নৈতিক চাপ। মনের মাঝে নৈতিকতা বোধ জাগিয়ে তুলতে পারলেই সদগুণাবলী জন্মলাভ করবে এবং তখন এই মন খাঁটি সোনা হয়ে গড়ে উঠবে। আবার এই নৈতিক চাপ হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত। বস্তুত এই স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে তিনটি বিষয়ের দ্বারা ইতিপূর্বে যার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহলো : (ক) স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস স্থাপন, (খ) পুরো জিন্দেগির কার্যাবলীর জবাবদিহির চেতনা এবং (গ) স্রষ্টার প্রেরিত আদেশ-নিষেধ অনুসরণ। এই তিনটি মূলনীতির কষ্টি পাথরে মনকে ঘষে-মেজে নির্মল রাখতে হবে, তবেই সোনার মতো ঝক্‌ঝক্ করবে মন এবং সেই মনের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত চরিত্রই আলোকিত করবে সমস্ত পরিবেশ। তখন আপনা আপনি উজ্জ্বল-উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে পুরো মানুষটি।

তখন—

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে। স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকবে। এই স্বামী-স্ত্রীর ঘরে যে ফুটফুটে সন্তান পয়দা হবে সে হবে আদর্শ সন্তান। সে সন্তানের আচার-ব্যবহারের মাধুর্যে শুধু পিতা-মাতাই নয়, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজন সবাই মুগ্ধ হবে এবং সোনার সন্তান হিসেবে আদর-যত্ন পাবে সকলের কাছে।

ছাত্র মনোনিবেশ করবে পড়াশুনায়—প্রস্তুতি নিবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে। শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করবে। জীবনকে গড়ে তুলবে সোনার মতো খাঁটি করে। সে ন্যায়পরায়ণতাকে সাদরে গ্রহণ করবে আর দুর্নীতিকে করবে বর্জন। সততা ও সচ্চরিত্রের প্রতি থাকবে তার আগ্রহ এবং অসত্য ও অসচ্চরিত্রের প্রতি থাকবে ঘৃণা।

শিক্ষক তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করবেন একনিষ্ঠভাবে। ভবিষ্যত জাতি গঠনের কঠিন দায়িত্ব তাঁর ওপর একথা স্মরণ রেখেই কর্তব্য পালন করবেন তিনি। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে শিক্ষার্থী আকৃষ্ট হবে তার প্রতি এবং স্বীয় চরিত্র গঠন করবে শিক্ষকের আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে।

বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক সকলেই নিঃস্বার্থভাবে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাদের নিজ নিজ কর্মতৎপরতা চালাবেন। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মন ও মানসিকতাকে সদগুণ গ্রহণে আগ্রহশীল করে তুলতে সচেষ্ট হবেন তারা। তাঁদের আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ আহ্বানে তখন মনের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগরিত হবে এবং কুপ্রবৃত্তিগুলো হবে দমিত।

সমাজ-সংস্কারক প্রথমে নিজের চরিত্রের সংস্কার করে সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। তিনি তাঁর সমাজকর্মীদেরকে আদর্শ চরিত্রবান করে গড়ে তুলবেন। পরহিতসাধন অগ্রাধিকার লাভ করবে তাঁর নিজের কাছে ও তাঁর কর্মীবাহিনীর কাছেও। তখন তাঁর কর্মীবাহিনীর হাতে যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করলে ক্ষমতার এতটুকু অপব্যবহার করবে না তাঁরা এবং অবহেলা করবে না দায়িত্ব পালনে।

বিচারক ন্যায় বিচারের মানদণ্ড সমুন্নত রাখবেন সর্বাবস্থায়। আইনের কাছে সবাইকে সমান অধিকার দেয়া হবে। পক্ষপাতিত্ব তিল পরিমাণ স্থান পাবে না তাঁর কাছে। বাইরের চাপ অথবা কোন স্বার্থপরতার কথা মনে এলেই কেঁপে উঠবে তাঁর মন। অপর কোন লোক বিশেষ এক অপরাধে যে শাস্তি পাবার যোগ্য, বিচারকের নিজের সন্তান সে অপরাধ করলে ঐ একই শাস্তি দেবেন তিনি তাকে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক হবে সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক। শ্রমিক তার শ্রমের যথাযথ মর্যাদা পাবে আর মালিক সহানুভূতি সহকারে শ্রমিকের দাবি পূরণ করবে। বরং শ্রমিককে প্রাপ্যের চাইতে একটু বেশি দেয়া হবে।

ব্যবসায়ী লাভের অংশটাকেই ব্যবসার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে না করে সমাজ সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেবেন না

www.pathagar.com

ব্যবসার মতো জনসেবামূলক গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

ডাক্তার অর্থোপার্জনকে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে না করে রোগ-নিরাময় ও রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।

উকিল-মোকতার আইন ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার কাজেও সচেষ্ট হবেন এবং জনগণকে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা থেকে বিরত রেখে জাতি গঠনমূলক কাজে সাহায্য করবেন।

সাধারণ সৈনিক ও সেনাপতি দু'জনই আত্মত্যাগের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন দুনিয়ার সামনে। এই আত্মত্যাগের কারণে দেশ হবে শক্তিশালী এবং জাতি হবে গৌরবান্বিত।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দায়িত্ব সচেতন হয়ে উঠবে এবং সমাজ গঠনের কাজে সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। তারা নিজেদেরকে সুখী ও পরিতৃপ্ত বোধ করবে এবং অপর লোকদেরও সুখী ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। তখন তারা সমবেত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং ন্যায়ের সমর্থনে একযোগে কাজ করবে। তখন প্রেম ও প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবে সমাজ জীবনে। এই সমাজ হবে এক আদর্শ সমাজ। এমনকি অপর দেশ ও অপর জাতি এই আদর্শ সমাজকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে গৌরব বোধ করবে।

রাষ্ট্র পরিচালক ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সারা দেশের কল্যাণ কামনায় সদা নিয়ত জাগ্রত থাকবেন। প্রতি মুহূর্ত মনে রাখবেন যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের সুখ-দুঃখের জন্যে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে স্রষ্টার কাছে। এমন কি রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি দ্রব্য-বস্তুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁরই এবং এজন্যে তাঁকে দায়ী করা হবে বিচারের দিন। এই দায়িত্ববোধ ও আত্মজিজ্ঞাসা তাঁকে অস্থির করবে প্রতিমুহূর্ত। আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কারণে তাঁর এই অস্থিরতাও অতি মূল্যবান ও অনন্য। তিনি জাতির সেবক হিসেবে এই পৃথিবীতেও জনগণের ভালোবাসা লাভ করবেন এবং কাল বিচার-দিনে আল্লাহ্‌র কাছেও সর্বোত্তম পুরস্কার লাভ করবেন। আর এই চিরস্থায়ী পুরস্কারই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সর্ববৃহৎ সাফল্য। রাষ্ট্র পরিচালক নিজে আদর্শ চরিত্রের হবেন। রাষ্ট্রের লোকদের চরিত্র গঠনে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এজন্যে অন্য লোকের চাইতে তিনি অধিক প্রতিদান পাবার যোগ্য। তাঁর নিজের সৎ কর্মের জন্যে তাঁর প্রাপ্য তো আছেই, তাঁর প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের যেসব লোক সৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হলো তাদের সৎ কর্মের জন্যেও রাষ্ট্র পরিচালক প্রতিদান লাভ করবেন—এটাই যুক্তিযুক্ত, এটাই আল্লাহ্ পাকের বিধান। অতএব কাল কেয়ামতে রাষ্ট্রনায়কের পদমর্যাদা একজন সাধারণ নাগরিকের পদমর্যাদার চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে হবে, অবশ্য রাষ্ট্রনায়ক যদি

www.pathagar.com

সত্যিকারের আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক হন তবে।

বস্তুত এসব শুধু কল্পনা নয়। বাস্তব দুনিয়ায় এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার। ইতিহাস সাক্ষী, উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা ইতিহাসে বহুবার সৃষ্টি হয়েছেন, এ যুগেও সৃষ্টি হচ্ছেন। আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে হবে একটা বিশেষ মানসিকতার ওপর। আর সে মানসিকতা জন্মলাভ করতে পারে শুধুমাত্র পূর্বোল্লেখিত তিনটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এই তিনটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই মনুষ্যত্ব চরম বিকাশ লাভ করতে পারে। আমাদের আদর্শ মানুষ গড়ার সৌধ-কাঠামো রচনা করতে হবে এই মূল ভিত্তির ওপর। শুধু কোন এক নির্দিষ্ট যুগ বা দেশের লোকের জন্যই নয়, বরং সকল দেশের ও সকল যুগের লোকের জন্যে এইটিই একমাত্র গ্রহণীয় পন্থা। মানবতা ও মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার এছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। যুগে যুগে চিন্তাবিদরা জনমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করেছেন। এতে মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছে বটে ; কিন্তু সমস্যাবহুল গোটা জীবনের পরিপূর্ণ সমাধান কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই তো সেদিনকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাগাসাকি ও হিরোসিমা বিধ্বস্ত হবার পর জাপানে এম. আর. ও (Moral Re-armament Organisation) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। মানুষের মনে নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে আত্মঘাতি যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিশ্বমানবকে নিষ্কৃতি দেয়া ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। এতে আফ্রিকা, আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশ থেকে সদস্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলার কোন সুস্পষ্ট কর্মসূচী না থাকায় এই সংস্থা আতুর ঘরেই মারা গেছে। এমনিভাবে প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর জীবদ্দশায় যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তাঁর আওয়াজ ছিল একক আওয়াজ এবং তাঁর আহ্বানের সমর্থনে কোন সুস্পষ্ট নীতিনির্ধারক কর্মসূচী ছিল না বলে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। আজো বিশ্ব-শান্তি পরিষদ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সোচ্চার ; কিন্তু অশান্তি সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাতে কান দিচ্ছে না এতটুকু। কখনো ভিয়েতনামে, কখনো কম্বোডিয়ায় আবার কখনো মধ্যপ্রাচ্যে মানুষের পবিত্র রক্ত দিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে প্রতিদিন। ইদানিং ভারত সাগরের শীতল-শান্ত পানি অশান্ত-উত্তপ্ত করার পাঁয়তারা চলছে।

অতএব সংকীর্ণতা পরিহার করে আসুন আমরা সবাই মিলে এই বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দেই। আসুন আমরা প্রথমত নিজের দেশে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বনেতৃত্বকে জলদগম্ভীর স্বরে ডেকে বলি : তোমরা স্রষ্টাকে ভয় কর— তোমাদের প্রতিটি কর্মের জন্যে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে—একথা স্মরণ রেখে তোমরা প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর এবং স্রষ্টার বাণীবহ মহামানবদের নেতৃত্ব গ্রহণ কর। এতে তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন হবে সুখের ; তোমাদের জাতীয়

www.pathagar.com

জীবন হবে সমুজ্জ্বল—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে দুনিয়ার বুকে। একমাত্র এই নীতি অনুসরণ করেই আমরা নিজের দেশের সকল শ্রেণীর লোকদেরকে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মানুষ রূপে গড়তে পারবো। এই মানুষকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। তাকে 'ভালো মানুষ' বলে ডাকুন, 'সোনার মানুষ' বলে ডাকুন, 'খাঁটি মানুষ' বলে ডাকুন, 'লৌহ মানব' আখ্যা দিন, প্রকৃতপক্ষে এই মানুষেরই চাহিদা সারা দুনিয়া জুড়ে। আমরা এই মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গড়তে পারলে সেটা হবে আদর্শ সমাজ এবং তখন দুনিয়ার সামনে এই আদর্শ সমাজকে সগৌরবে তুলে ধরতে পারবো আমরা। আসুন আমরা সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও পিছে চলার ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করে এই সার্বিক কল্যাণের পথে এগোই।

স্রষ্টাকে অস্বীকার করে এবং স্রষ্টার প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করে আদিকাল থেকে দুনিয়ার নিরীহ মানুষের ওপর বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষা করা হয়েছে ; কিন্তু এর কোনটাই মানব-সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়নি। এগুলোর অধিকাংশ মতবাদই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো পরিত্যক্ত হবার পথে। তাই উক্ত অসম্পূর্ণ, পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত মতাদর্শের প্রতি মোহমায়া পরিত্যাগ করে এবং গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে স্রষ্টায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ওপর রচিত চিন্তাধারা অনুসারে আমাদের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং তদানুসারে মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে দিকভ্রান্ত জীবনযাপনে তিল পরিমাণ কালক্ষেপণের আর সময় নেই। চলুন আমাদের নিজেদের সমাজে এবং অশান্ত বিশ্বে শান্তির আলোকবর্তিতা জ্বালিয়ে বিধ্বস্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে যাই।

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানুষ গড়ার বাস্তব কর্মসূচী পেশ করার পর মনে আরও একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সেটা হলো সেই কর্মসূচী অনুসারে কোনো যুগে 'আদর্শ মানুষ' তৈরি হয়েছিল কি না ? যদি হয়ে থাকে তবেই তো এই কর্মপদ্ধতির বাস্তবতা ও সফলতার দাবি গ্রহণযোগ্য। আর তখনই এর ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে এই কর্মপদ্ধতির বাস্তব রূপ দিতে অগ্রসর হওয়া যায়। আদর্শ মানুষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা থেকে কয়েকটি মাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁর জীবনের কর্মতৎপরতার দু'চারটি ঘটনা পরবর্তী অধ্যায়ে পেশ করা হচ্ছে। এ থেকে তাঁদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নেয়া সহজ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্ত

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ছিলেন আল্লাহ্ প্রেরিত রাসুল। তাঁর চরিত্র আল্লাহর ইচ্ছানুসারে গঠিত হয়েছিল। 'আপনি শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে ভূষিত'—আল্লাহ্ স্বয়ং একথা ঘোষণা করেছেন। অতএব এখানে রাসুলুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা না করে বরং তাঁর ছোঁয়াচ লেগে সাধারণ মানুষ কিভাবে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সেটার আলোচনাই অধিক সময়োপযোগী হবে বলে মনে হয়।

রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর অনুসারীদের চরিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর একটানা ত্রিশ বছর যে যুগ কেটেছে সেটা ছিল সোনালী যুগ। এর পর সমাজ জীবনে কিছুটা শিথিলতা এলেও সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠনে যে দৃষ্টান্ত রাসুলে খোদা (সঃ) স্থাপন করে গেছেন সে অনুসারে ইতিহাসে প্রত্যেক যুগেই বেশ কিছু সংখ্যক আদর্শ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্য থেকে দু'চারজন আদর্শ মানুষের যৎকিঞ্চিত আলোচনা করলেই প্রমাণিত হবে যে, আজো তাঁরা অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করছেন ইতিহাসের পাতায় ও আমাদের মানসপটে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করছি। History of The Arabs বইয়ের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন :

After the death of the Prophet sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere.

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ্র ইন্তেকালের পর যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়াচে অনুর্বর আরব দেশ অসংখ্য ও অতুলনীয় বীরপুরুষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো—সংখ্যা ও গুণের দিক দিয়ে যাদের সমতুল্য কোথাও কখনো পাওয় যায়নি।

হযরত আবু বকর (রাঃ)

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা:) খলিফা নির্বাচিত হন। আজকের মতো সার্বজনীন নির্বাচন পদ্ধতি তখনকার আরব গোত্রে পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল এবং গোত্রের প্রত্যেক লোক নেতা নির্বাচনে নিজস্ব মত দিতে পারতো। হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর বয়সের গুণে এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রাপ্ত পদমর্যাদার

www.pathagar.com

বলে সমস্ত আরববাসীর চোখে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ্‌র ওফাতের পর তিনিই খলিফা তথা রাসুলুল্লাহ্‌র প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন।

খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা:) সমবেত জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এর পর মদিনার মস্‌জিদে অনাড়ম্বর পরিবেশে অথচ অফুরন্ত উল্লাসের মধ্যে তাঁর অভিষেক তথা 'বায়আত' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন :

"হে জনমণ্ডলী! আমার ওপর শাসনের গুরুভার অর্পণ করা হয়েছে। খলিফা হলেও আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, এই পদ আমি কখনও নিজ ইচ্ছায় গ্রহণ করিনি। আমি চাইনি অপর কাউকে না দিয়ে আমাকে এই পদ দেয়া হোক। এই পদ লাভ করার জন্যে আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া-মোনাজাতও করিনি। এ পদের জন্যে আমার মনে কখনো লোভ হয়নি। এই পদে আমার কোন আনন্দ নেই—এটা তো একটা বড় রকমের বোঝা আমার ওপর চাপানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এই গুরুভার বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি চাচ্ছিলাম অন্য কেউ এই দায়িত্ব পালন করুক। এখনো যদি আপনারা চান রাসুলুল্লাহ্‌র সাহাবীদের মধ্য থেকে অপর কাউকে এই পদে নির্বাচিত করতে পারেন। আমার বায়আত (আনুগত্যের শপথ) এই পথে বাধার সৃষ্টি করবে না। আমি যদি ঠিক পথে চলি আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন আর যদি ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করি, আমাকে উপদেশ দিয়ে সঠিক পথে আনবেন। শাসনভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে সত্য হচ্ছে একটা আমানত এবং অন্য লোকের পক্ষে সত্য প্রকাশ করা বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য পালন করার শামিল। মনে রাখবেন, আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করতে না পেরেছি। আবার আপনাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য উসুল করে না নিয়েছি। আরো মনে রাখবেন, কোন জাতি আল্লাহ্‌র পথে কর্মতৎপরতা ত্যাগ করলে সে জাতির ওপর অবশ্যই অবমাননা নেমে আসবে, অশ্লীলতা প্রসার লাভ করবে এবং ব্যাপক আকারে দুঃখ-দৈন্য আপতিত হবে। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলকে অনুসরণ করে চলবো, আপনারা আমাকে ততক্ষণ মেনে চলবেন। আর আমি যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলকে ত্যাগ করি, তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করি, তাহলে আপনাদের আনুগত্যের বিন্দুমাত্র অধিকারও আমার থাকবে না।"

হযরত আবু বকর (রা:)-র এই ভাষণ থেকে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সুমহান মানসিকতার একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-র জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

হযরত আবু বকর (রা:) খলিফা নির্বাচিত হবার পরদিন বিক্রির জন্যে কাপড়ের

www.pathagar.com

একটি পোটলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কারণ খলিফা হবার আগে তাঁর জীবিকা অর্জনের পথ এটাই ছিল। পথে হযরত ওমর (রা:)-র সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি এটা কি করছেন ? হযরত আবু বকর (রা:) উত্তর দেন, 'এছাড়া আমি আমার পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবো কি করে ?' তখন হযরত ওমর (রা:) বলেন, চলুন রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল-মাল) সচিব আবু ওবায়দার সাথে আলাপ করি। হযরত আবু ওবায়দার গোচরে একথা আনলে তিনি বলেন, একজন সাধারণ মুহাজিরের অবস্থা সামনে রেখে খলিফাকে একটা ভাতা নির্ধারিত করে দেয়া হচ্ছে, যেটা সব চাইতে ধনী ব্যক্তিরও নয় এবং সব চাইতে গরিব ব্যক্তির সমানও নয়। তখন বার্ষিক চার হাজার দিরহামের একটা ভাতা নির্ধারণ করা হলো ; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হযরত আবু বকর ওয়াসিয়াত করে যান যে, তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে আট হাজার দিরহাম যেন বায়তুল-মালে পরিশোধ করা হয়—যা তিনি খলিফা থাকা অবস্থায় ভাতা হিসেবে নিয়েছিলেন।

তবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ্ (স:) সাহাবীদের যুদ্ধ-তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার আবেদন জানান। হযরত ওমর (রা:) ও হযরত আবু বকর (রা:) উভয়ের মধ্যে সৎ কাজের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব বিরাজ করতো। এবার হযরত ওমর (রা:) মনে করলেন তিনি হযরত আবু বকরের চাইতে অধিক সম্পদ দান করে জিতে যাবেন। দু'জনই নিজ নিজ সম্পদ নিয়ে এলেন। রাসুলুল্লাহ (স:) হযরত ওমরকে (রা:) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এনেছ এবং ছেলেমেয়েদের জন্যে ঘরে কি রেখে এসেছ ? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেকটা নিয়ে এসেছি বাকি অর্ধেক ছেলেমেয়েদের জন্যে ঘরে রেখে এসেছি। এর পর রাসুলুল্লাহ্ (স:) হযরত আবু বকর (রা:)-কে একই প্রশ্ন করলেন। উত্তরে তিনি বললেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার কাছে যা ছিল সব নিয়ে এসেছি আর আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে রেখে এসেছি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের নাম।

সিরিয়া অভিযানে হযরত ওসামার (রা:) নেতৃত্বে বিদায়ী সেনাবাহিনীকে হযরত আবু বকর (রা:) উপদেশবাণী প্রদান করে বললেন :

তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা পরিহার করে চলবে। কিছুতেই সৎ পথ থেকে পদস্খলিত হবে না। কারো অঙ্গচ্ছেদ করবে না, কোন বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোককে হত্যা করবে না। খেজুর গাছ এবং মানুষ ও পশুর খাদ্যদানকারী কোন গাছ নষ্ট করবে না। খাদ্যের জন্যে প্রয়োজন ছাড়া উট, মেষ ও গবাদিপশু বধ করবে না। মুণ্ডিত মস্তকের পুরোহিতগণ বশ্যতা স্বীকার করলে নির্যাতন করবে না।

হযরত আবু বকর (রা:) তাঁর শাসনকালে নিজ গোত্রের কোন লোককে শাসনকার্যের কোন দায়িত্বে নিয়োগ করেননি। কারণ তাতে স্বজন-প্রীতি উৎসাহ

www.pathagar.com

পাবার কথা। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীক তেজস্বিতার একটি পরিচয় পাওয়া যায় হযরত ফাতিমার (রা:) দাবি না-মঞ্জুর করার মধ্যে। রাসুলুল্লাহর জীবদ্দশায় ফিদক নামক সম্পত্তির আয় থেকে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ করা হতো। রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ফাতিমা (রা:) এই সম্পত্তি দাবি করলে হযরত আবু বকর (রা:) তা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন। তিনি এটাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেন।

হযরত আবু বকর (রা:) বহির্জগতে ইসলামের বিজয় অভিযান পরিচালনা করার আগে আরব দেশকে একটি আদর্শ দেশ ও সমাজকে একটি আদর্শ সমাজ রূপে গড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম আরব জাতিকে সুসংহত ও আদর্শ জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন। অধ্যাপক হিট্টি এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

Arabia had to conquer itself before it could conquer the world. অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ে বের হবার আগে আরবদেরকে নিজেদের দেশকেই প্রথম জয় করতে হয়েছে।

হযরত ওমর (রা:)

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা:) খলিফা নির্বাচিত হন। খিলাফত গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা:) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

হযরত ওমরের (রা:) খিলাফতের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। তাঁর শাসন যুগ একটি অবিস্মরণীয় ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগ। ইসলামের সোনালী যুগের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন হযরত ওমর (রা:)। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব, গৌরবময় বিজয় ও নিখুঁত শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র ইসলামের ইতিহাসেই নয় বিশ্ব-ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নবযুগের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাল্যকাল থেকেই হযরত ওমর (রা:) অদম্য কর্মস্পৃহা, সরলতা ও সাহসিকতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। খলিফা হবার আগে তাঁর স্বভাবে কঠোরতা ছিল। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাঁর স্বভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। সমাজ ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল সুগভীর ও স্পষ্ট। বেদুইন মরুচারী আরবরা ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও একগুয়ে। এদেরকে এবং বিজিত দেশসমূহের আদর্শ বিমুখ বাসিন্দাদেরকে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হযরত ওমরের (রা:) কোমল-কঠোর অথচ উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থারই প্রয়োজন ছিল।

হযরত ওমরের (রা:) চরিত্র ছিল সরল ও আড়ম্বরহীন। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক হয়েও দীন-হীন মানুষের মতো জাঁকজমকহীন জীবনযাপন

www.pathagar.com

করতেন। তাঁর বেশভূশা ছিল অত্যন্ত মামুলি ধরনের। বহিরাগত কোন লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে সে বিস্মিত হয়ে যেতো। খিলাফত গ্রহণ করার পর প্রথম দিকে রাজকোষ থেকে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। এর আগে নিজস্ব ব্যবসা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন তিনি। খলিফা হবার পর অন্য কোন কাজ করার অবসর ছিল না বলে যৎসামান্য ভাতা গ্রহণ করেন। ১৫ হিজরীতে যখন রাষ্ট্রের অন্যান্য লোকের ভাতা নির্ধারিত হয় তখন হযরত ওমরের (রা:) জন্যে অন্যান্যদের মতো বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারিত হয়।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে রাষ্ট্রপ্রধান (খলিফা) কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন সে সম্পর্কে হযরত ওমর (রা:) তাঁর এক ভাষণে বলেন :

"গ্রীষ্মকালের জন্যে এক জোড়া ও শীতকালের জন্যে এক জোড়া কাপড় এবং কুরাইশদের একজন মধ্যবিত্ত লোকের জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে ভাতা প্রয়োজন তার চাইতে অধিক কিছু গ্রহণ করা আমার জন্যে হালাল (বৈধ) নয়। আমি সাধারণ মুসলমানেরই একজন, এর বেশি কিছু নই। রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে (১) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করা। (২) ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করা এবং (৩) অন্যায়ভাবে ব্যয় থেকে বিরত থাকা। আপনাদের এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে আমার সম্পর্ক হচ্ছে এতিম-অনাথের সম্পত্তি রক্ষকের মতো। আমার নিজের প্রয়োজন না হলে আমি এ থেকে কিছুই নেবো না আর প্রয়োজন হলে তদানুসারে ন্যায়সঙ্গতভাবেই গ্রহণ করবো।"

হযরত ওমরের (রা:) কাছে ছোট-বড়, ধনী-গরিব এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোন প্রভেদ ছিল না বরং সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। মদ্যপানের অপরাধে তিনি স্বীয় পুত্র আবু শাহামাকে নিজ হাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। খালিদ-বিন ওয়ালিদের (রা:) মতো বিশ্ববিশ্রুত সেনাপতিকেও বরখাস্ত করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি ও নাগরিক সাধারণের মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। অষ্টাদশ হিজরীতে সিরিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় তিনি নিজ কাঁধে খাদ্য বহন করে নিয়ে দুস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন। লোকদের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি আরবদের মধ্যে দাস প্রথা রহিত করে তাদেরকে মানুষের সত্যিকারের মর্যাদা প্রদান করেন। তাঁর কল্যাণ-নীতির ফলে সারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার এক মনোরম পরিবেশ বিরাজ করতো। জনগণের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, মজলুমের আশ্রয়স্থল এবং পথহারার পথপ্রদর্শক। আজো বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্র পরিচালক হযরত ওমরের (রা:) মহান চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন ও অনুপ্রেরণা পেতে পারেন।

হযরত ওমর (রা:) এমন একজন আদর্শ স্থানীয় শাসক ছিলেন ইতিহাসে যার নজির বিরল। তাঁর বিজয়-অভিযান ছিল অনন্য সাধারণ, শাসক হিসেবে তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন অদ্বিতীয়। আদর্শ সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তিনি যে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটা আজো অনুকরণীয় বলে প্রতীয়মান হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মনীষীগণ কর্মজীবনে বিশেষ কোন একটা দিকে তাঁদের উল্লেখযোগ্য প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন ; কিন্তু হযরত ওমরের (রা:) জীবনচরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায়, তাতে ছিল বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর 'আল-ফারুক' বইয়ে হযরত ওমরের (রা:) বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করে বলেন : হযরত ওমর (রা:) একাধারে ছিলেন আলেকজান্ডার ও এরিস্টোটল। তিনি হযরত মসিহ্ও ছিলেন, হযরত সোলাইমানও। তৈমুর ও নওশিরওয়ার নৃপতিদ্বয়ের সদ্গুণাবলী ছিল তাঁর স্বভাবে। হযরত আবু হানিফার (রা:) শিক্ষা ও আইনজ্ঞতা এবং ইব্রাহিম-বিন্-আদহামের ধর্মনিষ্ঠা হযরত ওমরের (রা:) চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

হযরত ওমরের (রা:) এই আদর্শ চরিত্র বলেই তিনি তাঁর দশ বছর শাসন আমলে আরব সাম্রাজ্যকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিট্টি বলেন : Starting with nothing the Moslim Arabian Caliphate had now grown to the strongest power of the world. অর্থাৎ হযরত ওমর শূন্যতা নিয়ে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আরব সাম্রাজ্যকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা:)-র জীবন-চরিত্র থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

খলিফা ওমর (রা:) এক ব্যক্তির কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘোড়া খরিদ করেন যে, পছন্দ হলে ঘোড়াটি রেখে দেবেন নচেৎ ফেরত দেবেন। ঘোড় সওয়ার ঘোড়াটি পরীক্ষা করে দেখার সময় সেটা ল্যাংড়া হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা:) ঘোড়াটি ফেরত দিতে চাইলে মালিক ফেরত নিতে অস্বীকার করে। উভয় পক্ষ কাজীর কাছে বিচার প্রার্থী হন। কাজী বিচারের রায় দেন যে, ঘোড়াটি হয় হযরত ওমরকে (রা:) রেখে দিতে হবে নতুবা যে অবস্থায় সেটা নিয়েছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। গোটা মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র নেতা হয়েও হযরত ওমর (রা:) বিচারের এই ফয়সালা মেনে নেন এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নি।

কোদামা-বিন মজউন (রা:) হযরত ওমরের (রা:) শ্যালক ও সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি মদ্যপানের অপরাধ করলে তাঁকে প্রকাশ্যে ৮০ কোড়া শাস্তি প্রদান করা হয়। স্বীয় সন্তান আবু শাহামাকেও এই অপরাধে খলিফা নিজ হাতে বেত্রাঘাত করেন এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে।

হযরত ওমর (রা:) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক তাঁকে মধু খাবার জন্যে বলেন। সরকারি গুদামে মধু রাখা ছিল ; কিন্তু জনগণের অনুমতি ছাড়া

www.pathagar.com

তিনি মধু ব্যবহার করতে রাজি হননি। মদিনার মসজিদে গিয়ে লোকদের কাছে বল্লেন : আপনারা অনুমতি দিলে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামান্য মধু গ্রহণ করতে পারি। জনসাধারণ অবশ্য অনুমতি দিয়েছিল।

যুদ্ধে পরিত্যক্ত কিছু গনিমতের দ্রব্য হযরত ওমরের (রা:) কাছে এলে হযরত হাফসা (রা:) (যিনি ছিলেন হযরত ওমরের (রা:) কন্যা এবং রাসুলুল্লাহর (স:) বিবি) কন্যা হিসেবে ওসব দ্রব্য থেকে কিছু অংশ দাবি করেন। তখন স্বীয় কন্যাকে হযরত ওমর (রা:) বলেন : বেটি, তোমার অধিকার শুধু আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। এটা গনিমতের সম্পত্তি, এটার মালিক রাষ্ট্র। এ থেকে তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারি না। বাধ্য হয়ে হযরত হাফসা (রা:) খালি হাতে ফিরে যান।

সিরিয়া জয় করার পর রোম সম্রাটের সাথে হযরত ওমরের (রা:) সদ্ভাব কায়েম হয়। একবার হযরত ওমরের (রা:) বিবি উম্মে কুলসুম সম্রাটের অন্দরমহলের জন্যে কিছু সুগন্ধি ভরা শিশি পাঠান। সেখান থেকে আবার এই শিশিগুলোতে মূল্যবান মণিমুক্তা ভরে ফেরত পাঠানো হয়। হযরত ওমর (রা:) এই ঘটনা জানতে পেরে বিবিকে বললেন : শিশিতে পাঠানো সুগন্ধি আতর তোমার ছিল বটে ; কিন্তু বাহক ছিল সরকারি এবং ঐ সময়কার মজুরি তাকে বায়তুল মাল থেকেই দেয়া হয়েছে। তাই তিনি মণিমুক্তগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) সব সময় রাষ্ট্রের সব খবরা-খবর রাখতেন, সকল প্রকার অভিযোগ শুনতেন এবং সেগুলোর প্রতিকার করতেন ; কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলতেন : বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরগণ লোকদের প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ থাকেন কি না কে জানে! দূর-দূরান্তের লোক আমার কাছে পৌঁছতে পারে না। তাই তিনি সিরিয়া, বসরা, কুফা ইত্যাদি স্থানসমূহ সফর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রত্যেক জায়গায় দু'মাস করে থাকবেন মনস্থ করলেন। সফরের শেষ পর্যায়ে যখন শ্যামদেশে পৌঁছলেন এবং প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলায় অবস্থান করে লোকদের অভাব-অভিযোগ শোনার পর মদিনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখনকার একটি ঘটনা।

ফেরার পথে রাস্তার পাশে একটি তাঁবু দেখতে পান। সাওয়ারী থেকে নেমে তিনি তাঁবুর কাছে গেলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনি ওমর সম্পর্কে কিছু জানেন ? বৃদ্ধা উত্তরে বললেন : শুনেছি তিনি শ্যাম থেকে ফিরে যাচ্ছেন। খোদা তাঁকে বরবাদ করুন। আমি আজ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে এক কপর্দকও পাইনি। হযরত ওমর (রা:) বললেন : ওমর এত দূরের খবর কি করে জানবে ? বৃদ্ধা তখন রাগ করে বললেন : তিনি যদি রাষ্ট্রের নাগরিকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতে না পারেন তবে খিলাফতের দায়িত্ব নিয়েছেন কেন ? বৃদ্ধার এই উত্তর হযরত উমরের (রা:) হৃদয়

www.pathagar.com

স্পর্শ করে এবং তিনি কেঁদে ফেলেন।

একবার একটি কাফেলা মদিনা এসে শহরের কাছে অবস্থান করে। হযরত ওমর (রা:) তখন নিজে এর খোঁজ-খবর নিতে সেখানে যান। হঠাৎ এ দিক থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পান। কাছে গিয়ে জানতে পারেন একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তান মা-র কোলে বসে কাঁদছে। তিনি বাচ্চার মা-কে কান্না থামাতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আবার সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি রাগ করে মা-কে বললেন : তুমি অত্যন্ত নির্দয়। বাচ্চার মা বললো : তুমি তো আসল ব্যাপার জান না, অনর্থক আমাকে বিরক্ত করছ। ওমরের (রা:) নির্দেশ হচ্ছে যতদিন শিশু মা-র দুধ খেতে থাকবে ততদিন তাকে সরকারি ভাতা দেয়া হবে না। আমি সেজন্যে জোর করে বাচ্চাকে দুধ ছাড়াচ্ছি আর সে এজন্যেই কাঁদছে। একথা শুনে হযরত ওমরের (রা:) মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হলো। তিনি নিজে নিজে বলতে লাগলেন : হে ওমর! না জানি তুমি এভাবে কত বাচ্চাকে হালাক করেছ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই ভাতা মঞ্জুর করা হবে।

একবার জনৈক বেদুইন হযরত ওমরের (রা:) কাছে এসে একটি কবিতার অংশ পাঠ করছিল যার অর্থ হচ্ছে : ওহে ওমর! কোন আনন্দে থাকলে তা বেহেশ্‌তেরই আনন্দ। তুমি আমার স্ত্রীকে ও কন্যাদের বস্ত্র দাও—খোদার কসম করে বলছি, তোমাকে এটা করতেই হবে। হযরত ওমর (রা:) বললেন : আমি যদি তোমার কথা না শুনি তবে কি হবে? বেদুইন বললো : তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আমার সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তখন তুমি হতবাক হয়ে যাবে এবং তখন তোমাকে বেহেশ্‌ত অথবা দোজখের দিকে যেতে হবে। বেদুইনের এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা:) এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেল। এর পর খাদেমকে ডেকে বললেন : নাও আমার এই জামাটা ওকে দিয়ে দাও। এই মুহূর্তে আমার কাছে এছাড়া আর কিছুই নেই।

একবার তিনি লোকদেরকে খাওয়াচ্ছিলেন। একটি লোককে বাম হাতে খেতে দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি বাম হাতে খাচ্ছ কেন? সে বললো ঃ মওতার যুদ্ধে আমার ডান হাত হারিয়েছি তাই বাম হাতে খাচ্ছি। হযরত ওমর (রা:) এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং তার দিকে চেয়ে বললেন : আমার দুঃখ হচ্ছে তোমাকে কে অযু করিয়ে দেয়, কে মাথায় পানি ঢেলে দেয়, কে তোমাকে কাপড়-জামা পরিয়ে দেয়। এর পর তিনি ঐ লোকটির জন্যে একজন খাদেম নিয়োগ করে দিলেন এবং তার সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থাও করলেন।

খলিফা ওমর (রা:) নিজে পানির মশক বহন করে নিচ্ছেন। খলিফার পুত্র এটা পছন্দ করেন না ; কিন্তু খলিফা বলেন, তাঁর মনে যাতে কোন প্রকার আত্মগৌরব ও অহংকার না আসতে পারে সেজন্যে তিনি এ কাজ করছেন।

www.pathagar.com

একদিন হযরত ওমর (রা:) মস্‌জিদে খোতবা দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বললো : আমরা আপনার কথা শুনবো না যে পর্যন্ত না আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দেন। খলিফা তার প্রশ্ন জানতে চাইলেন। বেদুইন বললো : বায়তুল মাল থেকে আমরা রেশনে একই সমান কাপড় পেয়েছি ; কিন্তু সে কাপড়ে কারোর পূর্ণ জামা হয়নি। অথচ আপনার পরিধানে সে কাপড়ের জামা দেখা যাচ্ছে। আপনি অবশ্যই এক প্রস্থ্ বেশি কাপড় অন্যায়ভাবে নিয়েছেন।

মুসলিম বিশ্বের পরাক্রমশালী খলিফাকে এধরনের প্রশ্ন করায় উপস্থিত অনেকে বিব্রত বোধ করলেন। খলিফা জবাব দেয়ার আগেই তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রা:) দাঁড়িয়ে বললেন : আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আপনাদের মতো আমিও এক প্রস্থ কাপড় পেয়েছিলাম। আমি আমার অংশটুকু আমার পিতাকে দিয়েছি। দু'খণ্ড একত্র করেই তিনি জামা তৈরি করে নিয়েছেন। অতঃপর খলিফা শান্ত স্বরে লোকটিকে বললেন : যদি সত্যি আমি এক খণ্ড বস্ত্র বেশি গ্রহণ করতাম তুমি কি করতে ? তরবারি বের করে নিঃশঙ্ক চিত্তে বেদুইন জবাব দিল : এই তরবারি দিয়ে আপনার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করতাম। চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে খলিফা গর্জন করে বললেন : তুমি কার সামনে একথা বলছ তা অবগত আছ ? বেদুইন জবাব দিল : আমি অবশ্যই আমিরুল মুমেনিনের সাথে কথা বলছি। মস্‌জিদে যেন বজ্রপাত হলো। যে ওমরের (রা:) ভয়ে পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য কম্পমান, তার সামনে এরূপ কথা! খলিফা ওমর (রা:) বেদুইনের দিকে দৌড়ে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে জনতা লক্ষ করলো যে, খলিফা বেদুইনকে আলিঙ্গন করে বললেন : সমস্ত মস্‌জিদে যদি একটিমাত্র মুসলমান থাকে তাহলে তুমিই সে ব্যক্তি। ওমরের (রা:) শাসনে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের এই ছিল নমুনা।

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব সরকারের বলে খলিফা ওমর (রা:) বিশ্বাস করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন : যদি ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও অনাহারে মারা যায়, ওমরকে সে জন্যেও আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

খলিফা ওমর (রা:) তাঁর শাসনকালে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে মহৎ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, বর্তমান বিশ্বে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদ ও বৈষম্য বিলুপ্ত হয়েছিল ওমরের (রা:) শাসনের সৌজন্যে।

জেরুজালেমের প্রধান খ্রিস্টান ধর্মগুরু সাফ্রোনিয়াস খলিফা ওমরের (রা:) কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর হাতে শহরের চাবি অর্পণের প্রস্তাব করে আরব শিবিরে মুসলিম দূত পাঠান। সেনাপতি আবু ওবায়দা খলিফাকে এই সংবাদ জানান। ১৬ই হিজরীর রজব মাসে একমাত্র খাদেম সমভিব্যাহারে একটি উট

www.pathagar.com

নিয়ে তাঁর চিরাচরিত দীন পোশাকে হযরত ওমর (রা:) জেরুজালেম রওয়ানা হন। পালাক্রমে খলিফা ও খাদেম উটের পিঠে চড়ে জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হলেন। শহরে পৌঁছবার সময় খাদেম উটের পিঠে এবং খলিফা উটের রশি টানতে টানতে শহরে প্রবেশ করেন। অর্ধ-পৃথিবীর খলিফার এই সর্বত্যাগী দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানরা বিস্মিত হয়ে বিনাদ্বিধায় তাঁর হস্তে প্যালেস্টাইন শহরের সর্বময় ভার তুলে দিল। সামান্য কর দানের প্রতিশ্রুতিতে শহরের বাসিন্দাগণ তাদের ধর্মীয় ও জানমালের নিরাপত্তা ফিরে পেল।

হযরত ওসমান (রা:)

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওসমান (রা:) খলিফা নির্বাচিত হন। সর্বপ্রথম যে কয়জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত ওসমান (রা:) তাঁদের অন্যতম। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। মুসলমান হবার পর তিনি তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। ইসলামের উদ্দেশে দানের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা:)-এর পরই হযরত ওসমানের (রা:) নাম। মদিনায় কূপ খনন ও মস্‌জিদ সম্প্রসারণের জন্যে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। তবুক অভিযানের সময় তিনি এক হাজার দিরহাম ও এক হাজার উট দান করেন। হোদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে মক্কা যান। এমনিভাবে খিলাফত-পূর্ব জীবনে তিনি ইসলামের জন্যে অসামান্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাসুলুল্লাহ্ (স:) তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আরব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি। খলিফা থাকাকালীন তিনি বায়তুল মাল থেকে বেতন-ভাতা হিসেবে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নি অথবা পরিবারবর্গের জন্যে এক কপর্দকও ব্যয় করেন নি।

হযরত ওসমান (রা:) সর্বোতভাবে রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করে গেছেন। কোমলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ইসলামের মহত্তর ঐক্যের খাতিরে এবং মানবতার নামে তিনি মুসলিম ভাইদের রক্তপাত অপেক্ষা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

তিনি বহু কল্যাণকর কার্যাদি সম্পন্ন করেন। তাঁর নির্দেশে কাবাগৃহের সম্প্রসারণ, মদিনা মস্‌জিদের পুনর্নির্মাণ এবং কুফায় একটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন নির্মিত হয়। তাছাড়া রাজ্যের সর্বত্র সরাইখানা নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। তিনি আতুর, বিধবা ও দরিদ্র-নিরাশ্রয়দের বিশেষ যত্ন নিতেন। নিজের অর্জিত অর্থ দ্বারা এদের সাহায্য করতেন। কোটিপতি হিসেবে তিনি খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ; কিন্তু দীনহীনের মতো পরলোক গমন করেন। জীবনের শেষ দিনে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলতে হজ্বের জন্যে মাত্র দু'টি উট

www.pathagar.com

ছিল। তিনি কুরআন শরিফের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করে যে অপূর্ব অবদান রেখে গেছেন তার জন্যে তিনি ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে থাকবেন।

খিলাফত গ্রহণের আগে হযরত ওসমানের (রা:) কাছে সিরিয়া থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে একটি বিরাট কাফেলা আসে। গম, যায়তুনের তেল ও মোনাক্কা বোঝাই ছিল এই এক হাজার উটের কাফেলায়। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা এসময় অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী হযরত ওসমানের (রা:) কাছে এসে এই মাল খরিদ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা এই মালের জন্যে খরিদমূল্যের উপর কত লাভ দিতে রাজি ? তারা দ্বিগুণ লাভ দেয়ার প্রস্তাব করে। তিনি তখন বলেন : আমার কাছে তো এর চাইতে আরো বেশি লাভ দেয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা তখন হতবাক হয়ে বললো : আবু ওমর! (হযরত ওসমানের ডাক নাম) মদিনার সকল ব্যবসায়ী তো এখন আপনার সামনে উপস্থিত। আমাদের আগে আপনার কাছে অপর কেউ আসেনি। তাহলে এমন ব্যক্তি কে, যে আপনার কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছে ? হযরত ওসমান (রা:) জবাবে বললেন : আল্লাহ্‌পাক একের বদলে দশগুণ দেয়ার ওয়াদা করেছেন আমার সাথে। তোমরা কি এর চাইতে আরো বেশি দিতে সক্ষম ? তারা বললো : না, এত বেশি দিতে আমরা সক্ষম নই। তখন হযরত ওসমান (রা:) ঐ কাফেলার সমস্ত পণ্যদ্রব্য আল্লাহ্‌র রাহে গরিব মিস্‌কিনদের মধ্যে ছদকা স্বরূপ বিনামূল্যে বিতরণ করার ঘোষণা দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা:) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অধ্যাপক হিট্টি হযরত আলীর (রা:) গুণাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : "Valiant in the battle, wise in counsel, eloquent in speech, true to his friends, magnanimous to his foes, he became the paragon of muslim nobility and chivalry."

অর্থাৎ হযরত আলী (রা:) ছিলেন যুদ্ধে তেজোদীপ্ত, পরামর্শ দানে বিজ্ঞ, বক্তৃতায় স্বচ্ছ সাবলীল, বন্ধুদের প্রতি অকপট এবং শত্রুদের প্রতি দয়াশীল। আলী ছিলেন মুস্‌লিম মাহাত্ম্য ও শৌর্য-বীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ঐতিহাসিক মাসুদীর বর্ণনা অনুসারে :

"রাসুলুল্লাহর সাহাবাগণ যে সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন যেমন ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী হওয়া, রাসুলের (স:) জন্যে হিজরত করা, তাঁর সহায়তা করা, রাসুলের (স:) সাথে রক্তের সম্পর্ক, তাঁর জন্যে জীবন দান করা, আল্লাহর কেতাব এবং ওহির গুঢ় তত্ত্বে জ্ঞানী হওয়া, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, সাধুতা, পবিত্রতা,

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা এবং আইন বিজ্ঞানের জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছুতেই হযরত আলীর (রা:) পরিপূর্ণ অংশ বিদ্যমান ছিল।”

হযরত আলীর (রা:) জীবন ছিল অনাড়ম্বর, সরল ও ইসলামের উদ্দেশে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কর্মতৎপরতায় ঐকান্তিকতা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও আন্তরিকতা ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। তিনি ছিলেন রিক্তের বন্ধু, ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক। রাসুলুল্লাহ (স:) তাঁর অসীম সাহসিকতার জন্যে হযরত আলীকে (রা:) “আসাদুল্লাহ্” বা আল্লাহর শার্দুল উপাধিতে ভূষিত করেন। অশেষ দৈহিক শক্তির অধিকারী হলেও তাঁর হৃদয় ছিল কুসুমের মতো কোমল। রিক্ত ও নিরাশ্রয়ের বেদনায় তাঁর অন্তঃকরণ বিগলিত হয়ে যেতো। বক্তিগত জীবনে থাকা-খাওয়া ও বেশভূষা ইত্যাদিতে তিনি রাসুলুল্লাহ (স:) ও প্রথম খলিফাদের অনুসরণ করতেন। তিনি কখনো প্রতিহিংসার পথ অনুসরণ করেন নি। সমঝোতা ও আপোসের মাধ্যমে তিনি সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে ভালোবাসতেন।

তিনি কুরআন, হাদিস, কাব্য, দর্শন ও আইনশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ তাঁকে “জ্ঞানের দুর্গ” বলতেন।

হযরত আলী (রা:) খলিফা থাকাকালীন তাঁর যুদ্ধাস্ত্র বর্ম হারিয়ে গেলে সেটা একজন ইহুদির কাছে পাওয়া যায়। কাজীর আদালতে মোকদ্দমা পেশ হয়। কাজী হযরত আলীকে (রা:) সাক্ষী হাজির করতে বলেন। তিনি হযরত হাসানকে (রা:) হাজির করেন। কাজী তখন হযরত হাসানের (রা:) সাক্ষ্য নিতে অস্বীকার করেন। এতে হযরত আলী (রা:) কাজীকে লক্ষ্য করে বলেন : আপনি কি শোনেন নি যে, রাসুলুল্লাহ্ (স:) হাসান ও হুসাইন দু'জনকে বেহেশতের যুবকদের নেতা বলে আখ্যা দিয়েছেন ? তখন কাজী বললেন : তা তো আমি শুনেছি ; কিন্তু পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজী ইহুদির পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেন আর হযরত আলীও (রা:) খুশি মনে তা মেনে নেন। ইসলামের এই ন্যায়বিচার ও খোদ খলিফার বিচারের প্রতি মর্যাদা দান ইহুদির মনে বিরাট পরিবর্তন আনে এবং সে মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত আলীর (রা:) জীবনের দু'একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

হযরত আলী (রা:) আনুগত্যের শপথ (বায়আত) নেয়ার পর সর্বপ্রথম যে নীতিনির্ধারক ভাষণ প্রদান করেন, তিনি তাঁর শাসন আমলে তা পুরোপুরি মেনে চলেন। এই ভাষণে তিনি প্রথমেই বলেন :

হে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রের নিকট আপনাদের প্রাপ্য যে অধিকার রয়েছে, আমার জন্যেও সে একই অধিকার এবং আপনাদের ওপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় আমাকেও সেসব দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তব্য পালন করে চলতে হবে...।

হযরত আলীর (রা:) অবস্থা ছিল এরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্‌র (স:) আদরের কন্যা বিবি ফাতিমা (রা:) নিজ হাতে গম ভাঙতেন এবং রুটি তৈরি করে হযরত আলীকে (রা:) খেতে দিতেন। একবার একটি গমের বস্তার ওপর সিলমোহর করার সময় বলছিলেন : আমি শুধুমাত্র হালাল ও পাক-পবিত্র খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করতে পারি। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, নিজের কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্যে নিজের ব্যবহারের তরবারি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।

এক প্রাদেশিক গভর্নরকে তিনি একবার লিখে পাঠান :

"পর্দার অন্তরালে নিজেকে জনসাধারণ থেকে পৃথক করে রেখ না। শাসক ও শাসিতের মাঝখানে এই ব্যবধান সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এ কারণে জনসাধারণ সঠিক তথ্য জানতে পারে না। ছোট ছোট ব্যাপারও তাদের সামনে তখন বিরাট হয়ে দেখা দেয় এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও নগণ্য বলে মনে হয়। তখন কল্যাণকর কাজ মন্দ রূপ ধারণ করে এবং মন্দ কাজ ভালো মনে হয়। তখন সত্য-মিথ্যার তারতম্য করা সম্ভব হয় না।"

এই নির্দেশ অপরকে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজেও এই নিয়ম পালন করেছেন। তিনি নিজে প্রত্যহ কুফা শহরের বাজারে বেরিয়ে লোকদের সাথে মেলামেশা করতেন। তাদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতেন, তারা সততার সাথে ব্যবসা করছে কি না। বিদেশী কোন আগন্তুক চোখের সামনে খলিফাকে এভাবে ঘুরতে দেখলেও বুঝতে পারতো না যে, ইসলামী দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নিজে ঘুরে ঘুরে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ নিরসনের জন্যে সদা-সতর্ক। কারণ খলিফার পোশাক-আশাকে কোন প্রকার শাহি জাঁকজমকের লেশমাত্রও থাকতো না এবং সামনে ও পেছনে কোন দেহরক্ষী লোকদেরকে হটিয়ে খলিফার পথ পরিষ্কার করতেও ব্যাপৃত থাকতো না।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয

সুদীর্ঘ ৯২ বছর যাবত উমাইয়া বংশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হযরত ওমর বিন আবদুল আযিযের শাসনামল ছিল অত্যুজ্জ্বল। যে ঘটনাটি তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তন করেছিল সেটা হচ্ছে এই : ৯৩ হিজরীতে ওমর মদিনার গভর্নর ছিলেন। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক এ সময় রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইরের পুত্র খুবাইবকে ৫০ কোড়া (বেত্রাঘাত) শাস্তি দেয়া হয়। এর পর দারুণ শীতের মধ্যে তাঁর মাথায় মোশক থেকে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হয়। অতঃপর সারাদিন মদিনার মস্‌জিদের দরজার সামনে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই অমানুষিক শাস্তির কারণে অবশেষে তাঁর মৃত্যু

www.pathagar.com

ঘটে। এটা ছিল একটা চরম জুলুম ও নির্মম অবিচার। এই ঘটনার পর হযরত ওমর গভর্নরের পদ থেকে ইস্তিফা দেন এবং তিনি ইসলামী শরিয়তের পরিপন্থী এই নির্মম শাস্তিদানে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এতে তাঁর মর্মে ভীষণভাবে আল্লাহর ভয় উদ্রেক হয়।

৯৯ হিজরীতে সোলাইমান বিন আবদুল মালিক ওমর বিন আবদুল আযিযকে খলিফা নির্বাচিত করার গোপন নির্দেশ দিয়ে যান। হযরত ওমর খলিফা নির্বাচিত হলে পর আনুগত্যের শপথ (বায়আত) নেবার সময় যে ভাষণ দেন্ন তাতে তিনি বলেন : আমি খিলাফতের উমেদার না হওয়া সত্ত্বেও আমার মতামত না নিয়েই এবং মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করেই আমাকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ভীষণ পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আপনাদের ওপর আমার বায়আতের যে ভার অর্পণ করা হয়েছে আমি তা নামিয়ে দিয়ে আপনাদের মুক্ত করে দিচ্ছি। এখন আপনারা যাকে চান আপনাদের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করে নিন। হযরত ওমরের একথার পর উপস্থিত জনমণ্ডলী একবাক্যে বলে উঠলো : আমরা আপনাকেই চাই। আপনার শাসন পরিচালনায় আমরা সকলে রাজি। তখন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেন :

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পরওয়ারদিগার, নবী (স:) এবং আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, তাদের মতবিরোধ হচ্ছে দিনার ও দিরহাম অর্থাৎ ধন-সম্পদ নিয়ে। আল্লাহর কসম করে বলছি, অন্যায়ভাবে কাউকে আমি কিছু দেবোও না এবং ন্যায্যপ্রাপ্য থেকে কাউকে বঞ্চিতও করবো না। হে জনমণ্ডলী! যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত তার আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় আনুগত্য পাবার তার কোন অধিকার নেই। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্পাকের অনুগত থাকবো আমাকে মেনে চলবেন। আমি যদি আল্লাহ্র নাফরমানী করি তবে আমাকে মেনে চলা আপনাদের কখনো উচিত হবে না।"

এর পর হযরত ওমর তাঁর পূর্ববর্তীদের দ্বারা গৃহীত সকল জাঁকজমকপূর্ণ শাহী চালচলনের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং প্রথম চার খলিফার জীবনযাত্রার সাধারণ চালচলন গ্রহণ করেন। অতঃপর পূর্ববর্তীদের অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে তাঁর প্রাপ্ত সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফেরত দেন। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর অলংকারাদি পর্যন্ত বায়তুল-মালে জমা দেন। বার্ষিক ৪০ হাজার দিনারের আয়ের সম্পত্তি থেকে তাঁর ন্যায্যপ্রাপ্য মাত্র ৪ হাজার দিনারের সম্পত্তি নিজের কাছে রাখেন। এমনিভাবে সর্বপ্রথম আল্লাহ্পাক ও নিজের মধ্যকার হিসাব-কিতাব পরিষ্কার করে নেয়ার পর তিনি আগেকার ক্ষমতাসীন শাহী পরিবার ও তাঁদের আমিরদের বিরুদ্ধে যার যার অভিযোগ ছিল তা পেশ করার নির্দেশ জারি করেন। তখন অন্যায়ভাবে যেসব লোকের বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করা হয়েছিল, সব কিছু ফেরত দেয়া হয়। এতে উমাইয়া গোত্রের সকলের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যায়। এ অবস্থায় ওমর বিন আবদুল

www.pathagar.com

আযিযের ফুফু ফাতিমা বিন্‌তে মারওয়ানকে তাঁর কাছে সুপারিশ করার জন্যে পাঠানো হয় যাতে ওমর এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। এই মহিলাকে ওমর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন বলেই তাঁকে পাঠানো হয় ; কিন্তু এই মহিলার অনুরোধের উত্তরে হযরত ওমর বলেন : শাসনকর্তার নিজের কোন নিকট আত্মীয় যখন জুলুম করে এবং তিনি এর কোন প্রতিকার করেন না তখন তিনি অপরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে ফিরে থাকার উপদেশ দিতে পারবেন কি করে ? এর উত্তরে ফাতিমা বললেন : তোমার উমাইয়া বংশের লোকেরা তোমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, তোমার এই আচরণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। তখন হযরত ওমর বললেন : রোজ কেয়ামতের ভয়ের চাইতে অন্য কোন জিনিসের ভয় আমার মনে থাকলে দোয়া করি তা থেকে আমি যেন নিস্তার না পাই। অবশেষে মহিলা নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়ে স্বীয় গোত্রের লোকদের বললেন : এসব তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তোমরা ওমর বিন খাত্তাবের মেয়ে বিয়ে করে এনেছিলে অবশেষে সন্তান তাঁর নানার (মাতামহ) পথ অনুসরণ করে যাচ্ছে। (হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয হযরত ওমর ফারুকের (রা:) দৌহিত্র ছিলেন)।

ওমর বিন আবদুল আযিযের দায়িত্ববোধ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, পূর্ববর্তী খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিককে দাফন করে যখন ফিরছিলেন তখন তাঁকে অত্যন্ত মলিন ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে এই চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : রাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এমন একটি প্রাণীও নেই, দাবি করার আগেই যার প্রাপ্য পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব নয়। তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বর্ণনা করেছেন : আমি তাঁর থাকার কোঠায় গিয়ে দেখি নামাযের মোছল্লায় বসে তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনার কি হয়েছে ? উত্তরে তিনি বললেন : মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের সকল দায়িত্বভার আমার মাথায় তুলে নিয়েছি। ভাবছি, কেউ ভুখা-নাঙ্গা রয়েছে, কেউ রোগাক্রান্ত, আবার কেউ মজলুম-নির্যাতিত, কেউ গরিব-বন্দি, কেউ আবার বৃদ্ধ-দুর্বল, সন্তান-সন্ততি নিয়ে কেউ নিঃস্ব-নিরাশ্রয়—দেশের সর্বত্র এ ধরনের লোক ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি, কাল কেয়ামতে পরওয়ারদিগার আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, এদের জন্যে আমি কি ব্যবস্থা করেছি। তখন মুহাম্মদও (স:) ওদের পক্ষ সমর্থন করে বিচারপ্রার্থী হবেন। ভয় হচ্ছে বিচারের রায় যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যায়। এসব ভেবে নিজের সম্পর্কে ভয়ে কাঁদছি।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয অত্যাচারী গভর্নরদের হটিয়ে তদস্থলে সহৃদয় শাসক নিয়োগ করেন। উমাইয়া শাসন আমলে অন্যায়ভাবে যেসব ট্যাক্স বসানো হয়েছিল সেগুলো রহিত করেন। অযথা কাউকে বেত্রাঘাত করতে নিষেধ করেন। খলিফার অনুমতি না নিয়ে কাউকে হত্যা অথবা হাত কর্তন করার উপরও তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর বিন আবদুল আযিযের শাসনকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

খলিফা হবার আগে হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয দামি কাপড়-জামা ব্যবহার করতেন ; কিন্তু খিলাফত গ্রহণ করার পর অতি সাধারণ জামা-কাপড় পরতে শুরু করেন। তিনি তখন সাদাসিধা খাদ্য গ্রহণ করে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তাঁকে আস্তাবলের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া ব্যবহার করতে বলা হয় ; কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বলেন : নিজের খচ্চরটাই আমার জন্যে যথেষ্ট।

ইমাম আওযায়ী বলেছেন : একদিন খলিফার বাড়িতে উমাইয়া গোত্রের সকল নেতৃস্থানীয় লোক বসা ছিল। ওমর বিন আবদুল আযিয তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের অভিপ্রায় যে, আমি তোমাদেরকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করি এবং কোন এলাকার গভর্নর পদ প্রদান করি ? তোমরা মনে রেখো আমি এতটুকু বরদাশত করতেও রাজি নই যে, তোমাদের দ্বারা আমার আঙ্গিনা অপবিত্র হোক। তোমাদের ব্যাপার সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি তোমাদের হাতে আল্লাহ্র দ্বীন ও মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারি না। তখন উপস্থিত সকলে বললেন : আত্মীয়তা হিসেবেও কি তোমার কাছে আমাদের কোন দাবি করার অধিকার নেই ? তিনি উত্তরে বললেন : এ ব্যাপারে তোমাদের এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে আমার কাছে তিল পরিমাণও পার্থক্য নেই।

বলাবাহুল্য যে, প্রথম চার খলিফার পর উমাইয়া খিলাফতের সময় গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি বিলুপ্ত হতে চলেছিল। কায়সার ও কিসরার অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বনি উমাইয়া কর্তৃক। হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয আবার ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর শাসন আমলে আবার খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ ফিরে এসেছিল।

ইউনুস ইবনে আবি শাবিব বলেছেন : খলিফা হবার আগেও আমি ওমরকে দেখেছি। তাঁর শরীর মোটাতাজা হওয়ার কারণে পাজামার নেয়াড় কোমরে ঢুকে থাকতো ; কিন্তু খলিফা হবার পর শরীর এত শুকিয়ে গিয়েছিল যে, শরীরের হাড় ক'খানা গুনে নেয়া যেতো। হযরত ওমরের ছেলে বলেছেন : মৃত্যুর সময় বাবার কাছে মাত্র চারশত দিনার ছিল।

মুসালামা ইবনে আবদুল মালিক বলেছেন : ওমরের অসুখের সময় তাঁকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম একটা ময়লা জামা পরে আছেন। তাঁর স্ত্রী ছিল আমার বোন, তাকে বললাম : পরিষ্কার করে দাও না কেন ? সে বললো : মাত্র একটা জামাই তো আছে।

হযরত ওমরের খাদেম আবু উমাইয়া বলেছেন : একদিন অন্দরমহলে গিয়ে বললাম : মসুর ডাল খেতে খেতে বিরক্তি ধরে গেছে। হযরত ওমরের স্ত্রী বললেন : তোমার কর্তারও তো ঐ একই খাদ্য।

www.pathagar.com

একদিন হযরত ওমর তাঁর স্ত্রীকে বললেন : আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা হয়। তোমার কাছে কিছু টাকা পয়সা থাকলে দাও। স্ত্রী বললেন : আমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই। আপনি আমিরুল মুমিনিন হয়েছেন অথচ আপনার কাছে কিছু আঙ্গুর কিনে খাবার পয়সাও নেই। তখন তিনি বললেন : আঙ্গুর খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মৃত্যু হওয়াটাই কাল কেয়ামতে দোজখের জিঞ্জিরের শাস্তি পাওয়ার চাইতে উত্তম।

ওমর বিন মুহাজির বলেছেন : তিন খণ্ড কাঠের ওপর মাটি দিয়ে বাতি তৈরি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় কাজে যতক্ষণ লোকদের সাথে আলোচনা হতো ততক্ষণ শাহী বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন। তারা উঠে গেলে নিজ কাজে তিনি নিজের বাতি জ্বালিয়ে নিতেন। একবার তাঁর খাদেমকে পানি গরম করতে বলেন। খাদেম শাহী বাবুরচিখানা থেকে পানি গরম করে আনলে পর তিনি তা জানতে পেরে এক দিরহামের কাঠ শাহী বাবুরচিখানায় পাঠিয়ে দেন।

খলিফার আরদালী ও চৌকিদার ছিল একশত জন। হযরত ওমর খলিফা হলে পর ঐসব লোকদেরকে বললেন : আমার হেফাজতের জন্যে আমার অদৃষ্টই যথেষ্ট। আমার নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা আপন আপন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পার।

খলিফা হবার পর তিনি যখন নিজ পরিবারের ব্যয় সংকোচ করলেন তখন তাঁর কাছে এর অভিযোগ এল। তিনি তখন বললেন আমার হাতে এত সম্পদ নেই যে, তোমাদের জন্যে আগেকার মতো ব্যয় করবো এবং বায়তুল মালেতো অন্য সব নাগরিকদের মতোই তোমাদেরও সমান অধিকার, তার চাইতে অধিক কিছুই নেই।

রিজা বিন হায়াত বলেছেন : একদিন আমি ওমর বিন্ আবদুল আযিযের কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ বাতি নিভে যায়। কাছেই খাদেম ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাকে জাগাতে চাইলে তিনি নিষেধ করলেন। তখন আমি নিজে উঠে বাতি ধরাতে চাইলাম। "মেহমানকে কষ্ট দেয়া ভদ্রতাবিরোধী"—এই বলে তিনি নিজেই উঠে বাতিতে তেল ঢেলে তা ধরিয়ে দিলেন এবং বললেন : আমি এখনো সে ওমর ইবনে আবদুল আযিযই রয়েছি যেরূপ প্রথমে ছিলাম। এভাবে বাতি জ্বালিয়ে নেয়ায় আমার মর্যাদার কোনই হানি হয়নি।

খলিফা হবার পর পুলিশের প্রধান নেজা হাতে নিয়ে খলিফার আগে আগে যাচ্ছিল, তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন : অন্যান্য মুসলমানদের মতো আমিও একজন সাধারণ মুসলমান।

এমনিভাবে খলিফার জন্যে বিশেষ ধরনের তাঁবু তৈরি করা ছিল, যেগুলোতে এর আগে কেউ থাকেনি ; কিন্তু তিনি সেগুলো বায়তুল মালে জমা দিলেন। এরপর ফরাশ বিছানো একটি কামরায় গিয়ে দেখলেন সেখানে এমন সব ফরাশ

www.pathagar.com

বিছানো হয়েছে যার ওপর শুধুমাত্র খলিফা বসেন। তিনি এগুলো মাড়িয়ে গিয়ে চাটাইতে বসলেন এবং দামি ফরাশগুলো বায়তুল মালে জমা দিতে বললেন।

বনি উমাইয়া খলিফাদের নিয়ম ছিল যখন খলিফা মারা যেতেন তখন তাঁর কাপড়-জামা সন্তানদের মধ্যে বন্টন করা হতো এবং যেসব জামা-কাপড় ও সুগন্ধি দ্রব্য অব্যবহৃত থাকতো সেগুলো নতুন খলিফা ব্যবহার করতেন। পূর্ববর্তী খলিফা সুলাইমান বিন্ আবদুল মালিক মারা যাবার পর তাঁর সন্তানরা এই নীতি পালনের দাবি জানালে হযরত ওমর বললেন : এগুলো তোমাদেরও নয় আমারও নয়। এগুলোর মালিক রাষ্ট্র। তখন তিনি সবগুলো জিনিস বায়তুল মালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এভাবে দুই বছর পাঁচ মাস চার দিন হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১০১ হিজরী ২৫শে রজব ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রা:)

ইমাম আবু হানিফার (রা:) পূর্ণ নাম হচ্ছে নোমান বিন ছাবিত। তিনি ৮০ হিজরীতে (৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ) কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির অধিকারী। প্রায় ত্রিশ বছরকাল কুরআনে-পাক ও হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ফিকাহ্শাস্ত্র রচনা করেন। প্রায় চল্লিশজন সহকারী তাঁর এই গবেষণার কাজে সাহায্য করেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের নাম এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে ফিকাহ্শাস্ত্র সংকলন করেন তার মধ্যে "ফিক্হুল আকবার" মুসলমানদের একটি অমূল্য সম্পদ। এতে ইবাদত, রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আইন-বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের আইন প্রণয়নে ইমাম আবু হানিফার (রা:) অবদান অতুলনীয়। তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রা:) ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। তদানীন্তন খলিফাগণ বারবার তাঁকে প্রধান বিচারকের (Chief Justice) পদ দিতে চাইলেও তিনি বারবার সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শাসকদের কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভীত হতেন না তিনি কোন অবস্থাতেই। এ কারণেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে এবং নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে সারাজীবন।

ইমাম আবু হানিফা (রা:) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আমদানি-রপ্তানি এবং

www.pathagar.com

কাপড়ের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করতেন তিনি। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে তিনি ব্যবসায়ী মহলে অত্যন্ত সম্মান লাভ করেছেন। তিনি এদিক দিয়ে ছিলেন একজন আদর্শ ব্যবসায়ী।

কুফা নগরীতে ছিল ইমাম আবু হানিফার কাপড় ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রস্থল। এখানেই তাঁর প্রধান দোকান ছিল। দোকানে নির্ধারিত মূল্যে কাপড় বিক্রি হতো। একবার ইমাম সাহেব দোকানে উপস্থিত নেই এমন সময় দোকানের কর্মচারী একজন গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত দামের চাইতে বেশি দামে কাপড় বিক্রি করে। ইমাম সাহেব দোকানে এসে বিক্রয়মূল্য হিসাব করে বললেন : তুমি আমার সাথে দোকানে থাক অথচ খরিদ্দারকে এভাবে ধোঁকা দাও ? তিনি বুঝতে পারলেন খরিদ্দার সরল বিশ্বাসে মাল খরিদ করেছে এবং নির্ধারিত দামই দিয়েছে। দাম বেশি চাওয়া হয়েছে একথা সে জানতে পারলে অবশ্যই দামা-দামি করে সে দাম কমাতো। খরিদ্দার ছিল মদিনাবাসী এবং সে মদিনা চলে গিয়েছিল। ইমাম সাহেব মদিনা শরিফ গিয়ে সে লোকের সাথে দেখা করেন এবং বর্ধিত মূল্য ফেরত দেন।

একবার এক থান-কাপড়ে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। ইমাম সাহেব খরিদ্দারকে ত্রুটি দেখিয়ে কাপড় বিক্রি করার জন্যে কর্মচারীকে নির্দেশ দেন ; কিন্তু অন্যান্য কাপড়ের সাথে এই ত্রুটিপূর্ণ থানও বিক্রি হয়ে যায়—কর্মচারী খরিদ্দারকে ত্রুটি দেখিয়ে দিতে ভুলে যায়। ইমাম সাহেব এ কথা জানতে পেরে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং খরিদ্দারকে খোঁজ করে না পেয়ে সমস্ত বিক্রয় মূল্য ত্রিশ হাজার দিরহাম ছদকা করে দেন।

ইমাম সাহেবের মহানুভবতার বহু ঘটনা তাঁর বিভিন্ন জীবন-চরিত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহু লোককে তিনি হাজার হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কেউ ধার নিলে এবং পরিশোধ করতে না পারলে তিনি তা মাফ করে দিতেন। একারণেই ১৫০ হিজরীতে ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের পর দেখা যায় তাঁর ত্যজ্য সম্পত্তি বলতে মাত্র এক জিল্‌দ কুরআন শরিফ ছাড়া আর কিছু নেই।

হযরত ফাতিমা (রা:)

রাসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা:) ছিলেন চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা:)-র সহধর্মিণী। হযরত ফাতিমাকে (রা:) রাসুলুল্লাহ্ (স:) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন হযরত হাসান ও হুসাইন (রা:)-র মাতা। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নারী। রাসুলের আদরের কন্যা হয়েও কোন প্রকার পার্থিব জাঁকজমক পছন্দ করেন নি। তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করতেন। গম পেষা, রুটি তৈরি করা, ঘরের ঝাড়পোছ, কুয়া থেকে পানি তুলে আনা ইত্যাদি ঘরের সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করতেন।

একবার রাসুলুল্লাহ্‌র (স:) কাছে ঘরের কাজ করার মতো কিছু লোক

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়। হযরত আলী (রা:) তখন বিবি ফাতিমাকে বলেন : তুমি রাসুলুল্লাহ্র কাছে গিয়ে একজন খাদেম চেয়ে আন, তাহলে তোমার কাজে সাহায্য হবে। ফাতিমা (রা:) পিতার কাছে গেলেন। সেখানে অনেক লোক বসা ছিল। ফাতিমা (রা:) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। পিতার নিকট কোন কথাই বলতে পারলেন না। তিনি ফিরে এলেন। পরের দিন রাসুলুল্লাহ্ (স:) নিজে কন্যার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা, তুমি গতকাল কি কাজে আমার কাছে গিয়েছিলে ? বিবি ফাতিমা (রা:) লজ্জাবশত কিছুই বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। তখন হযরত আলী (রা:) বললেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ্! ফাতিমার অবস্থা এই যে, গম পিষতে পিষতে হাতে ফোস্‌কা ধরে গেছে, মশকে করে পানি বয়ে আনতে আনতে শরীরে রশির দাগ পড়ে গেছে, চুলার কাছে বসে থাকতে থাকতে কাপড় জামা ময়লা হয়ে গেছে। আমি তাঁকে গতকাল বলেছিলাম যে, আপনার কাছে কিছু খাদেম এসেছে, একজন খাদেম চেয়ে আনতে। এজন্যেই কাল আপনার কাছে গিয়েছিল। একথা শোনার পর রাসুলুল্লাহ্ (স:) বিবি ফাতিমাকে (রা:) লক্ষ্য করে বললেন : বেটি, ওসব তো অপর লোকদের প্রাপ্য। ও থেকে তোমাকে দেয়া যাবে না। তুমি সবর কর, ধৈর্য রাখ। আল্লাহ্কে ভয় কর। স্বীয় পরওয়ারদিগারের কর্তব্য পালন কর। আর ঘরের কাজ নিজের হাতেই করবে। এরপর কন্যাকে কিছু দোয়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন : খাদেমের চাইতে এগুলো আরো উত্তম ও মূল্যবান। হযরত ফাতিমা (রাঃ) পিতার কথায় সন্তুষ্ট হলেন।

হযরত আলী (রা:) ও বিবি ফাতিমা (রাঃ) রোজা রেখেছেন। সন্ধ্যেবেলা ইফতার করবেন। এমন সময় একজন মিস্‌কিন, একজন এতিম ও একজন ভুখা কয়েদি এসে কিছু খাবার চায়। ঘরে মাত্র তিনটি রুটি ছিল। তখন তিনি তিন খণ্ড রুটির সবটাই দিয়ে দিলেন এবং দু'জনই অভুক্ত রইলেন।

গাজী সালাহউদ্দীন

ইতিহাস-বিখ্যাত ক্রুসেড বিজয়ী গাজী সালাহউদ্দীন ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম পুনরাধিকার করেন। এতে ইউরোপে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইসায়ীদের এই বিপর্যয়ে ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস্, জার্মানীর ফ্রেডারিক বারবারোসা এবং ইংল্যান্ডের রিচার্ড সম্মিলিত হয়ে জেরুজালেম পুনর্দখলের প্রস্তুতি নেন ; কিন্তু দুর্দমনীয় সালাহউদ্দীনের প্রতিরোধের মুখে তাদের সকল প্রচেষ্টা খড়ের মতো উড়ে যায়। অতঃপর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিন জন সম্রাটের সকলেই গাজী সালাহউদ্দীনের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হন।

গাজী সালাহউদ্দীন ছিলেন একজন আদর্শ সেনাপতি। তাঁর বদান্যতা, মহানুভবতা ও তাঁর আদর্শ চরিত্রের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছে :

www.pathagar.com

T. W. Arnold তাঁর The Preaching of Islam বইয়ে গাজী সালাহউদ্দীন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "The noble character of Saladin in the Crusades and the misrule of the Crusaders led many Christians of the Near East to prefer the Muslim rule to that of their co-religionists, and, after the victories of Saladin, Islam made great progress and the Church was further weakened." অর্থাৎ ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহউদ্দীনের আদর্শ চরিত্র এবং ক্রুসেডারদের কুশাসন 'নিকট-প্রাচ্যের বহু ইসায়ীকে তাদের সম-ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টানদের শাসনের চাইতে মুস্লিম-শাসনকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে বাধ্য করে। সালাহউদ্দীনের বিজয়ের পর ইস্লামের অসাধারণ অগ্রগতি সাধিত হয়। অপরদিকে খ্রিস্টান গির্জার প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে হৃদয়হীন দুর্ব্যবহার করেছিল। সালাহউদ্দীন এ দুর্ব্যবহারের কথা ভালো করেই জানতেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নগরী পুনরুদ্ধারের পর তিনি পরাজিত খ্রিস্টানদের প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করেন ইতিহাসে তার নজির বিরল। সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর জেরুজালেমের নাগরিকবৃন্দ তাদের সকল অধিকার ফিরে পায়। ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীরা তীর্থ-করা ছাড়াই জেরুজালেম যাবার অনুমতি লাভ করে।

ইংল্যান্ডের ও ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় জ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁদের পীড়ার খবর পেয়ে অসুস্থতার সম্পূর্ণ সময় সালাহউদ্দীন তাঁদের জন্যে লেবাননের বরফ, শীতল পানীয় ও টাটকা ফল পাঠান। পরাজিত ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম পৌঁছলে তাদের অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্যে কোন চিকিৎসক ছিল না। তখন খ্রিস্টানদের এই মহান ও মহৎ শত্রু (?) সালাহউদ্দীন চিকিৎসার জন্যে মুসলমান ডাক্তার পাঠান।

১১৯৩ খ্রিস্টব্দের ৪ঠা মার্চ গাজী সালাহউদ্দীন ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করে সৈয়দ আমির আলী তাঁর History of Saracen বইয়ে বলেন : "যে দূত বাগদাদে সুলতান সালাহউদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসে, সে সুলতানের বর্ম, তাঁর অশ্ব, একটি দিনার ও ছত্রিশটি দিরহাম সঙ্গে এনেছিল। এটুকুই ছিল সুলতানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।"

আওরঙ্গযিব আলমগীর

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলমগীর দিল্লীর মসনদে সমাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয় আদর্শ শাসকদের অন্যতম। সুনিপুণ সেনাপতি ও শাসক হিসেবে এবং ধর্মভীরু ও নিরপেক্ষ প্রজারঞ্জক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বের সুবিখ্যাত শাসকদের মধ্যে আলমগীরের স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কর্তব্যপরায়ণতা ও সরল সহজ জীবনযাপন এবং নিরপেক্ষ শাসননীতি ও সততা ছিল তাঁর চরিত্রের

www.pathagar.com

অতি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। অসীম সাহসিকতা ও নিরলস কর্মক্ষমতার জন্যে মোগল সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়।

আলমগীর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি বলতেন : স্রষ্টা আমাকে পরের জন্যে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আমার নিজের জন্যে নয় বরং জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমরা দেখতে পাই আলমগীর তাঁর জীবনে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী ছিলেন। ক্ষমতা হাতে নিয়েই তিনি ব্যবসায়ী ও অমুসলমানদের ওপর থেকে ধার্যকৃত আশি প্রকার ট্যাক্স তুলে নেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে ধর্মকে নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করা এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাকে তিনি পছন্দ করেননি। একথা সত্য যে, আলমগীর ইসলাম ধর্মকে কলুষমুক্ত করে এর আসল রূপ তুলে ধরার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করেননি। একথাও সত্য যে, তিনি একজন মুসলমান হিসেবেই ভারত শাসন করেছেন এবং এ কারণেই আকবরের সময়ের প্রশ্রয়প্রাপ্ত অমুসলমান কর্তৃক বিদ্বেষবশত তিনি নিন্দিত। বলাবাহুল্য আলমগীর কার্যত ন্যায় বিচার ও অমুসলমানদেরও মুসলমানদের সমান অধিকার প্রদানে এতটুকু তারতম্য করেননি। আকবর যেসব অবাঞ্ছিত চরিত্রহানিকর নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করে ভারতবর্ষে একটা অবাস্তব জগাখিচুড়ি সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন আলমগীর সেসব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে রাজি হননি। আকবরের শাসনামলে মানবতার মর্যাদাহানিকর যেসব রেওয়াজ রীতি প্রবর্তিত করা হয়েছিল আলমগীর সেগুলোর বিলোপ সাধন করেন এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সমমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ পুনর্জীবিত করে তোলেন।

দুর্দমনীয় সাহস ও শৌর্য বীর্য এবং অসাধারণ মেধা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন আলমগীর। সিংহাসন লাভের চেষ্টা, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য-অভিযান তাঁর নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুনিপুণ সৈন্য-পরিচালনার নিদর্শন বহন করছে। বস্তুত আলমগীরের কূটনৈতিক জ্ঞান, যুদ্ধ নৈপুণ্য, রাষ্ট্রনীতি জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। শাসক হিসেবে তিনি নিজে প্রশাসন যন্ত্রের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখতেন। প্রজাসাধারণের কাছ থেকে বেআইনী ট্যাক্স উসুল এবং অন্যান্য জনস্বার্থবিরোধী কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সড়ক ও সেঁতু নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়।

আওরঙ্গযিব ছিলেন সুপণ্ডিত ও শিক্ষানুরাগী। তিনি রাজ্যে বহু শিক্ষাগার স্থাপন করেন। কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ফিকাহ্ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ফাতওয়ায়ে আলমগিরী" তাঁরই নির্দেশে রচিত হয়।

www.pathagar.com

আওরঙ্গযিব সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। তাঁর সময় জাসাবত সিং ও জয় সিং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকবরের সময় অমুসলমানরা যেসব উচ্চ পদ ভোগ করতে পারেনি, আলমগীর সেসব উচ্চপদেও তাদেরকে নিয়োগ করেছেন।

তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে জনগণের পবিত্র আমানত মনে করতেন। নিজের জন্যে তিনি এ থেকে কপর্দকও ব্যয় করেননি। তিনি হস্তলিখিত কুরআন মজিদ ও টুপি সেলাই করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁর নিজের ও পরিবারের ব্যয় বহন করতেন। রাজর্ষি আলমগীরের এই আত্মত্যাগ অনন্য সাধারণ, অচিন্তনীয় এতে কোন সন্দেহ নেই। জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন এবং অবৈধ খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে তিনি সারা জীবন বহু দূরে রয়েছেন। আচার-আচরণে বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে কঠোর, শিক্ষানুরাগী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মর্যাদাদানকারী, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় পত্র-লেখক, ন্যায় বিচারে নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী, অসি ও মসি উভয়ের সুনিপুণ অধিকারী—আলমগীর ছিলেন আদর্শ চরিত্রের এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

মৃত্যুশয্যায় বসে আলমগীর ফার্সি ভাষায় যে বার দফা বিশিষ্ট শেষপত্র ওয়াসিয়াতনামা লিখে যান তা থেকে দু'একটি দফার বাংলা তরজমা দিয়ে এই আলোচনা শেষ করা হচ্ছে।

২য় দফা : টুপি সেলাইয়ের মূল্য বাবদ আয়া বেগমের কাছে চার টাকা দু'আনা রাখা আছে। এই অর্থ দ্বারা আমি অধীনের দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করবে। হস্তলিখিত কুরআন মজিদের আয় থেকে তিন শত পাঁচ টাকা বিশেষ তহবিলে রাখা আছে। মৃত্যুর দিনে এই টাকা গরিব লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে এবং এই টাকা দাফন-কাফনে খরচ করবে না।

৪র্থ দফা : এই অধমকে খোলা মস্তকে দাফন করবে, মহান আল্লাহর দরবারে দীনহীন বেশে যাওয়াই শ্রেয়।

৫ম দফা : আমার লাশ বহনকারী কফিনের ওপর অতি মামুলী সাদা কাপড় স্থাপন করবে। শামিয়ানা স্থাপন করা থেকে বিরত থাকবে। আর আমার জন্যে কাউকে বিলাপ করতে দেবে না।

ইতিহাস থেকে আদর্শ মানুষের মাত্র দু'চারটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে সুদূর ও অদূর অতীতে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ মানুষের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। আদিকাল থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বহু

www.pathagar.com

মনীষী এবং আদর্শ চরিত্রের বহু মানুষ সব দেশে এবং সব যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। এই দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতেই এসেছিলেন তাঁরা। তাঁদের নির্মল চরিত্রের যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের জন্যে, আজকের মানুষও তা থেকে চলার পথের সঠিক সন্ধান পেতে পারে। শুধু অতীতকালেই নয়, বর্তমানকালেও বিভিন্ন দেশে এমন সব লোকের সন্ধান মেলে যাঁরা আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনমানবের কল্যাণ সাধনে সদা ব্যস্ত। মূলত আল্লাহ্‌র প্রতি যাঁদের মনে ভয় ও ভালোবাসা এবং কৃতকর্মের জন্যে যাদের মনে জবাবদিহির চেতনাবোধ সদা জাগ্রত তাঁরাই আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত—তাঁদের অমূল্য কথা ও কর্ম আমাদের ঝঞ্ঝাবহুল জীবন সাগরের দিশারী।

www.pathagar.com

গ্রন্থসূচী

তাফহীমুল কোরআন : মাওলানা আবুল আলা মওদুদী
ইসলাম কা নিযামে আদল : সাইয়েদ কুতুব
আল-ফারুক : মাওল্যানা শিবলী নোমানী
খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত : মাওলানা নোমানী
হেকায়াতুছ্ ছাহাবা : মাওলানা যাকারিয়া
ইস্লামের ইতিহাস : অধ্যাপক তাবারক আলী
A Short History of the Saracens : Syed Amir Ali
The Evidence of God in an Expanding
Universe : Edited by John Clover Mousma
A Dictionary of Science : E. B. Unvarov and D.R. Chapman
The Origin of life on Earth : Sir James Jeans
History of the Arabs : P.K. Hitti
Islam in the World : Dr. Zaki Ali
The Oford History of India : A Smith C. I. E
A New History of Indo-Pakistan Since Muslim Rule : Prof. K. Ali
Has the Man A Future ? : Bertrand Russel
উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী : মুহাম্মদ মিয়া
হযরত আবু হানিফা কী সিয়াসী যিন্দেগী : আল্লামা মানাযের হাসান গিলানী
সিরাতে ওমর বিন আবদুল আযিয : মাওলানা আবদুস সালাম নদ্ভী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঐতিহ্য

ISBN 984-776-268-6